Udvaban

Sristi
Shibpur

উদ্ভাবন

ডিজিটাল পত্রিকা

(প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা)

President's Desk

Dear Everyone,

Wishing all of you a very happy and prosperous new year.

It gives me immense pleasure to drive such a thriving organization for the past 10 months.

I would like to express my sincere gratitude and deep appreciation to each stakeholder including all the Sristians, the Donors and everyone associated with us. This year our combined efforts took Shibpur Sristi to new heights.

We were able to complete the first year of our highly anticipated "Shikshan" Project. We successfully delivered all the educational materials for 120 students who were very much deprived of basic educational materials. We also managed to provide free tution throughout the year and we engaged 10 qualified private tutors for them.

This year we have distributed new Clothes to almost 500 children of different parts of our State through our much-accloded Clothes Drive aka "Paridhan". The project achieved new heights when we successfully distributed 300 new blankets among the most poverty-stricken areas in Purulia. Thanks to our corporate partner "Style Bazar" for giving us a huge relief by supporting us for the said drive.

Our quench for a pollution-free and safe environment, made us organizing our very own "Sobuj Sankalpa" which is an environment awareness rally. We also have distributed 200 saplings through this initiative.

All these above projects make Shibpur Sristi much bigger than ever and our work just not stops here as we are breaking our records every year and setting new and higher goals for upcoming years.

Sustainability is something which we are craving since inception and day by day we are o our course of making all our projects and initiatives sustainable enough so that it produces much better results in the future.

Lastly, I am grateful to all the Sristians who tremendously worked for serving the deprived ones to make their lives better.

I hope we will make our 2020 much better than it was ever before.

Ritabrata Das

President

সহ সম্পাদিকার কলমে

প্রথমেই জানাই প্রত্যেকের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ , যারা অনবরত আমাদের পাশে থেকেছেন ও আছেন এবং আমাদের প্রয়াসকে সফল করার লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের পত্রিকা উদ্ভাবন এর প্রথম সংখ্যা আপনাদের কাছে পৌঁছায় গত ৮ই মার্চ। আমরা পেরিয়ে এসেছি তিন মাস। এই তিন মাসে বদলে গেছে অনেক কিছুই। দুটি ভয়ংকর অভিশাপে আজ বহু মানুষ আর আমাদের মধ্যে নেই। সেই মানুষদের জন্য আমরা গভীরভাবে শোকাহত। বিশ্বব্যাপী অতিমারীর কবলে মারা গেছেন ও যাচ্ছেন লাখ লাখ মানুষ। করোনার ভয়ে অতিষ্ঠ গোটা বিশ্ব। তারই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উপর আছড়ে পড়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আমফান। বাংলা এক ধ্বংসলীলার সাক্ষী থাকে। এই দুই অবস্থাতেই শিবপুর সৃষ্টি এগিয়ে গেছে দুঃস্থ মানুষের পাশে। পৌঁছে দিয়েছে ত্রান সামগ্রী। তবে এমতাবস্থাতেও আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি উদ্ভাবন ডিজিটাল পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা। এই দুঃসময়েও আমরা পেয়েছি আপনাদের সহযোগিতা তার জন্য আমরা আপ্লুত। 'উদ্ভাবন' পত্রিকা জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে আপনাদের প্রতিভার উদ্ভাবনে এগিয়ে এসেছে। কলম হল মনের ভাব প্রকাশের এক বড়ো হাতিয়ার। আর সেই কলমকে সঙ্গী করে আপনাদের লেখা গল্প, কবিতা, আঁকা, ছবির উদ্ভাবন ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য। আশা করছি আগামী দিনেও পাশে পাবো আপনাদের, এই দুঃসময় কাটিয়ে উঠব ঠিকই, এই ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে শুধু দরকার আমাদের নিজস্ব সচেতনতা। সব কিছুকে সাথে নিয়েই হাতে হাত রেখে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। নিজেদের স্বার্থেই আমাদের থাকতে হবে সুস্থ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খুব শীঘ্রই সুস্থ তিলোত্তমা সেজে উঠবে নিজের ছন্দে। এবং শেষে আবারও জানাই আমার সব সহকারী বন্ধু, বড়ো দিদি দাদাদের ধন্যবাদ।

সহ সম্পাদিকা
নেহা ভট্টাচার্য্য
উদ্ভাবন পত্রিকা

সূচিপত্র

মাষ্টারমশাই ---------- মৌসুমী দাস
গৃহলক্ষ্মী ---------- অঙ্কিত দাস
কলকাতা ও ট্রাম ---------- সাগ্নিকা দাস
উপহার ---------- দেবকান্ত মাজী
সুবর্ণা ---------- সিদ্ধার্থ বিশ্বাস
নিয়তি ---------- সৌরণীল সিনহা
দুই ঘরের গল্প ---------- অঙ্কিতা ঘোষ
গুমনামি ও আমি ---------- প্রদীপ্ত সান্যাল

দিগন্ত রেখা ---------- বৃষ্টি চৌধুরী
রণথম্ভোর ---------- প্রদিপ্ত সান্যাল

ধর্মযুদ্ধ ---------- স্নেহা কাঁড়ার
ভগবান নাকি বিজ্ঞান ---------- কৌস্তভ ঘোষ
ছিঃ, মানবিকতা ---------- অর্ণব চক্রবর্তী
সবুজ পৃথিবী ---------- শুভ বাঁক
হায় বাঙালি ---------- অর্ণব চক্রবর্তী
ভালোবাসা ---------- সৌম্যদীপ টাকী
কাজল পরা প্রেমিকার জন্য ---------- রনিত ঘোষ
কুহেলিকা পরোয়ানা ... ইতি মায়ানগর ---------- সুমন চৌধুরী
'YOU ARE NOT MY TYPE' ---------- নীলাঞ্জন বাকুলি
গোপন তত্ত্ব ---------- মেঘা পাত্র
বৈপরীত্য ---------- ইশিতা পাল
নগ্নামি ---------- শর্মিষ্ঠা জানা
সংসারি ---------- সন্দীপ চন্দ

Child Abuse and its Prevention – A Legal Analysis in Indian Context Aniruddha Karmakar

করোনার করালগ্রাস

একুশদিন হোম কোয়োরেন্টোইনে হাওড়া ব্রিজের আত্মকথা ---------- শর্মিষ্ঠা জানা

আজ সকালে ---------- সুমিত গাঙ্গুলি

ঈশ্বর করোনাময় ---------- একলব্য

করোনা ---------- তপন হাজরা

ফুলটুসি ---------- সন্দীপ বাগ

করোনা ---------- ঋষভ মিত্র

রোমাঞ্চের অন্তঃপুরে ---------- ঐকান্তিকা সিনহা

অঙ্কন

অনিন্দিতা ভট্টাচার্য	সুমনা মণ্ডল	রাজা দাস
দেবযানী ঘোষ	দেবপ্রিয় ঘোষ	সুরঞ্জিতা মল্লিক
স্বেতা কোলে	সুনীতি দোলুই	সৌমি ঘোষ
শ্রীময়ী ঘোষ	পূজা দাস	সায়ক সিনহা
রিয়া সরকার	মমতা চক্রবর্তী	প্রিয়াঙ্কা টাকি
তান্বিষ্ঠা করাতি	প্রদিপ্ত সান্যাল	সায়নী দাস
ঐন্দ্রিলা সিনহা	পৌলমি মান্না	স্বর্ণেন্দু ব্যানার্জী
ঐকান্তিকা সিনহা	শুভদেবলীনা বোস	রঙ্গন
অঙ্কিতা রায়	শুক্তি চক্রবর্তী	পৌলমি ভট্টাচার্য
স্নেহাশ্রী হাজরা	মনিশা সামন্ত	

ছবি

মনোজিৎ দত্ত	দীপন মজুমদার	পৌলামী গুপ্তা
পলাশ দাস	সম্বুদ্ধ সিনহা	শেখ মহম্মদ আকিব
কৌস্তভ চ্যাটার্জী	সৌরভ দে	অনিমেষ পল্লে
কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য	দেবপ্রিয় ঘোষ	সুমিত গাঙ্গুলি
অমৃতা পাল	শুভদীপ বাসক	দেবজ্যোতি বাগ
রাহুল দত্ত	রাজা দাস	

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

মাষ্টারমশাই

~ মৌসুমী দাস

আমার নাম অনির্বাণ। অনির্বাণ অধিকারী। ওই নামের প্রথম অক্ষরটি 'এ' হওয়ার দরুন জীবনের সব ঝুঁকিই আগে নিতে হয়েছে আর কি!

ঝুঁকি বলতে ক্লাসে রোল নম্বর প্রথমের দিকে থাকা। পরীক্ষায় সিট পড়া ফার্স্ট বেঞ্চে। মৌখিক পরীক্ষায় প্রশ্নবাণ গুলো যোদ্ধার মতো প্রথমে নিজের বুকে গেঁথে নেওয়া ইত্যাদি। তবে এই অভ্যাস আমাকে স্বনির্ভর হতে শিখিয়েছে। মানে কখনোই আগে বসা বন্ধুকে বলতে পারিনি যে " ভাই তুই এই চ্যাপ্টার টা ভালো করে পড়ে আসিস, আর আমি এটা পড়বো"। কারণ আগে তো কেউই নেই। আর আমার পিছনে বসা ব্যক্তিবর্গের কথা তো ছেড়েই দিলাম। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে স্কুল-কলেজ সব জায়গাতেই আমার দায়িত্ব ছিল ওই পিছনের ব্যাক্তিকে পাস করানোর। এই সুবাদে বেশ ভালো মন্দ খাবার উপহার পেয়েছে আমার পেট। কখনো পরীক্ষা শেষে ক্যান্টিনে মাটন চপ, কখনো চাউমিন আবার কখনো চিকেন পকোড়া।

যাই হোক, ছোট থেকে রেজাল্ট ভালই। আর পড়াশুনায় ভালো হওয়ার দরুন আত্মীয়সজনের কাছেও বেশ প্রিয় পাত্র আমি। পরিবারের কোন এক অনুষ্ঠানে ছোট পিসি বাবলার কান মোলা দিয়ে বলেছিল" দেখ, দাদাকে দেখে শেখ। একটু ইচ্ছাও করে না পড়তে বসার? এই দাদার এমন ভাই কে বলবে? এই শুনে মুচকি হেসেছিলাম সেইদিন। কিন্তু পরবর্তীকালে ভাগ্যলক্ষী আমার দিকে তাকিয়ে এমন শুকনো হাসি হাসবেন ভাবিনি। বাবলা পড়াশুনা না করেই ব্যবসায় যোগ দিয়েছিল পিসি মশাই এর। এখন মাটিতে পা পড়ে না। আর আমি? প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। বি.এস.সি গ্রাজুয়েট, ফিজিক্সে অনার্সের পর প্রাণপণ খেটেছি সেন্ট্রাল গভরমেন্ট চাকরির জন্য। টিউশন পড়ানোর সব টাকাই চলে যেত চাকরি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপে। বছরে কয়েক শত পরীক্ষা। প্রথম রাউন্ড ক্লিয়ার করার পর, না জানি কি হয়। শেষে হাতে ঠেকল প্রাইমারি স্কুলের চাকরি। তারপর আর কি, রিক্রুটমেন্ট হল দুটো গ্রাম ছাড়িয়ে একটি

স্কুলে। এতদিনে বন্ধুরা খিল্লি উড়িয়ে 'মাষ্টারমশাই' ডাকতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে বন্ধুমহলে কেমন আমি 'অনির্বাণ' এর থেকে বেশি 'মাষ্টারমশাই' নামে জনপ্রিয় হয়ে গেলাম। আত্মীয়-স্বজনরা বাড়িতে এসে কেমন যেন একটা আশ্বস্ত করার সুরে বলে " আরে প্রাইমারি তো কি হয়েছে, সরকারি চাকরি তো নাকি? কটা মানুষ পায় বলতো?" আমিও একটা মেকি হাসি সেঁটে নিয়ে, স্লথ এর মত ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়িয়ে ওদের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করি। বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে ফাঁকা মরুভূমির মতো। জীবনটা কি এভাবেই কাটবে? চার যোগ তিন সমান আট। আমি তাতে লাল কালি দিয়ে কেটে পাশে গোল্লা বসাবো। পিছন থেকে কেউ বলে উঠবে " স্যার বাথরুম যাব?" আমি পুরো ক্লাসরুমে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলবো" দুজন গেছে। ওরা আসুক, তারপর যাবি।" এই জন্য কি এত পড়াশোনা? এত ত্যাগ? এত অধ্যাবসায়?

মাঝে মাঝে খুব ক্লান্ত লাগে। ক্লাসরুমে বাচ্চাদের কোলাহলের মধ্যেও কোথাও যেন একটা হারিয়ে যাই। মাথায় ঘোরে ফিজিক্সের কঠিন ইকুয়েশন গুলো। জীবনটা ওই ইকুয়েশন গুলোর থেকেও কঠিন। যেটা সলভ করা হয়তো সাধ্যের বাইরে। এসব ভাবতে ভাবতে ক্লাস শেষের ঘন্টা পড়ে যায়। বাচ্চারা দ্বিগুণ তীব্রতার সাথে কোলাহল করতে থাকে। আমি ডাস্টার দিয়ে বোর্ড মুছে তারপর সেই ডাস্টার ক্লাস রুমের বাইরের দেয়ালে ঠুকে ঠুকে ঝাড়ার সময় ভাবি এই চক্ এর ধুলোর সাথে এই ঊনত্রিশ বছর বয়সী আমার ভবিষ্যৎ কেমন যেন হয়ে উড়ে গেল। তারপর হাওয়ার মধ্যে হাত দিয়ে ধুলো সরিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যাই টিচার্স রুমের দিকে। টিচার্স রুম, এটা আর এক বিচিত্র জায়গা। কাল দেবীকা ম্যাডামের কাজের লোক মালতী মাছের ঝোলে হলুদ বেশি দিয়েছিল। আর তাই জন্য ওনার হাত এখনো হলুদ হয়ে আছে। উনার বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি বর মেয়ে সবার হাত হলুদ হয়ে আছে। কে জানে মালতীর হাত হলুদ হয়েছে কিনা? উৎসাহ জাগলো। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, লজ্জার খাতিরে। মাঝে মাঝে ভাবি, বাড়িতে খবরের কাগজ টা বন্ধ করে দেব। কারণ বিশ্বের সব খবর এই টিচার্স রুমে আলোচনা হয়। কোথায় কি হচ্ছে, পার্টি পলিটিক্স, খেলার খবর থেকে শুরু করে আই.এস. আর.ও নতুন প্রযুক্তি সবকিছু জানা যাবে একটু কানটা খোলা রাখলেই। এবার আলোকপাত করা যাক বিগত কয়েকদিন থেকে নজরে আসা একটা নতুন সমস্যায়। ক্লাস ফোর এর কয়েকটা বাচ্চা টিফিন টাইম এর পর থেকে কেমন গায়েব হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ব্যাপারটা সেইভাবে গা করিনি।এত ছাত্র-ছাত্রী সবাইকে মনে রাখা

কি সম্ভব নাকি? আছে কোথাও। এইভেবে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা ভালোমতো আমার নজর কেড়েছে। ঠিক তাই, কয়েকজনকে সত্যিই টিফিন টাইম এর পর আর পাওয়া যাচ্ছে না। নাম অনুযায়ী চিহ্নিত করার জন্য টিফিনের পর ক্লাসে গিয়ে আরো একবার রোল কল করলাম। যা ভেবেছি ঠিক তাই। চারজন নেই। মানে সকালে ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। নাম গুলো লিখে রাখলাম আলাদা করে।

মনোজ সাঁতরা, দিপু মাল, চুমকি পান, আর শম্পা নস্কর। সাথে ক্লাসের বাকি বাচ্চাদের বলে এলাম এই চারজন ক্লাসে এলে যেন আমার সাথে গিয়ে দেখা করে টিচার্স রুমে। সাড়ে তিনটে এ ছুটির ঘন্টা বেজে গেল কিন্তু সেদিন কেউ এলো না। বুঝলাম টিফিনের পরেই এরা লুকিয়ে বাড়ি চলে যায়। ব্যাপারটা হেডস্যারকে জানাতেই হচ্ছে। হেড স্যারের কথা যখন উঠল তাহলে ওনার বিবরণ টা এখানেই দিয়ে দেওয়া যাক। খাদ্য রসিক মানুষ। খেতে খাওয়াতে পটু। সমস্ত পদ রান্নায় উনি সিদ্ধহস্ত। ওনার হাতের মাটন কারীর জবাব নেই। একদিন একটি দেশি মুরগি জোগাড় করেছিলেন। তারপরেই আমার ফোনে মেসেজ। লেখা আছে " অনির্বাণ, কাল টিফিন এনো না, দেশি মুরগি রেঁধে আনছি।" এককথায় উনার সাথে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বসুলভ। তাই আর বেশি না ভেবে পুরো ব্যাপারটা পরদিন গিয়ে হেডস্যার কে জানালাম। স্যার ওই চারজনকে ডেকে পাঠালেন।কারণ জানতে চাওয়া হলো তাদের এরকম কাজকর্মের। কিন্তু কোন উত্তরই পাওয়া গেল না। অতঃপর চারজনের বাড়িতে চিঠি পাঠানো হল। যেন তাদের অভিভাবকরা এসে স্কুলে দেখা করেন। পরদিন শনিবার। নাতো তাদের অভিভাবকরা কেউ এলো, না তো তারা কেউ এলো স্কুলে। সময় বাড়ার সাথে সাথে ব্যাপারটা থেকে আমার দৃষ্টি সরছিল। সোমবার আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। টিফিনের পর ওই চারজন ক্লাসে নেই। রাগ হল। এইটুকু বয়সের বাচ্চারা এরকম বেরেল্লাপনা করে কি করে? টিফিন টাইমের মিড ডে মিলের হইচই তে তেনারা পলাতক।

শেষে হেড স্যারের আদেশ" অনির্বাণ, তুমি একবার যাও বুঝলে? বাড়ির লোকজন হয়তো এসব খবরই পায় না। হয়তো চিঠিটাও বাবা-মায়ের হাতে দেয় নি ওরা। আজ চারজন করছে কাল চল্লিশজন জন করবে। স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হবে শুধু শুধু।" ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও স্কুলের খাতা গেটে ওদের ঠিকানা বের করলাম। হেড স্যারের কথায় আপত্তি জানানো আমার সাধ্যি নেই। বেরিয়ে পড়লাম আমার সদ্য

কেনা বাইক নিয়ে। ঠিকানা: মহিতোষ কলোনি। চারজনেরই বাড়ি ঐ কলোনিতে। গিয়ে খুঁজতে হবে। শিক্ষক জীবনে এটাই করার বাকি ছিল আর কি! এবার ষোলো কলা পূর্ণ হলো। পৌঁছে গেলাম মহিতোষ কলোনি। ছোট ঝুপড়ি ঘর দুপাশে আর মাঝে সরু রাস্তা। সেই রাস্তার ওপরই কারোর বালতি রাখা আছে। কেউ রাস্তার ধারে টাইম কলের জলে স্নান করছে। এই রাস্তায় গাড়ি চালানো কষ্টকর বললে কষ্ট রাও কষ্ট পাবে। এককথায় দুষ্কর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। আমার কাছে এই দৃশ্য স্বাভাবিক নয়। লোকজনকে ওদের নাম বলে খোঁজ করতে লাগলাম। কেউ কোন হদিস দিতে পারল না। শেষে একটি লোক মনোজ নামটি শুনে বলে উঠলো" ও তুমি আমাদের মন্টুকে খুঁজছো? এখান থেকে সোজা গিয়ে একটা তিন মাথা মোর আসবে, ওখানে একটা সবজি বাজার আছে। ওখানে পাবে ওকে ওর মায়ের সাথে।" ভদ্রলোকের নির্দেশমতো সেদিকেই প্রস্থান করলাম। গাড়িটা একটা জায়গায় রেখে বাজারের ভিতরে হাঁটালাম। দুপুর হয়ে গেছে তাই সবাই নিজেদের দোকানপাট গোছাতে ব্যস্ত। চট পেতে বসেছে সবজি বিক্রেতারা।

"ও দাদা কি লাগবে? পটল নিয়ে যান। পালংশাক একদম টাটকা, গোছানোর সময় কমে দিয়ে দেব, কত বলুন"। চোখে পড়লো মনোজ তার মাকে সাহায্য করছে। সামনে যেতেই কেমন একটা থতমত খেয়ে বললো " স্যার, আপনি এখানে?" আমি এই দৃশ্যের জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না। আমার চোখে রাগকে ছাপিয়ে এক অদ্ভুত খারাপ লাগা বিরাজ করছে। "কে রে মন্টু? তোর স্যার?" জিজ্ঞেস করলেন মনোজের মা। আর চোখে মুখে আলাদাই চমক। "নমস্কার স্যার" হাতজোড় করে আমাকে স্বাগত জানালেন। আমতা আমতা করে বললাম "আসলে মনোজ প্রায় রোজই টিফিনের পর..." "হ্যাঁ চলে আসো তো?আসলে আমি একা সবটা গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি যেতে পারি না। তাই ও সাহায্য করে আমাকে।" আমার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই উনি বললেন। "ওর বাবা চলে যাওয়ার পর আমাকে করতে হয় সব। রান্না পর্যন্ত করতে পারি না তাই দুপুরে খেয়ে চলে আসে।" এর উত্তর আমার কাছে নেই। আমি নির্বাক। চুপচাপ বেশ কিছুক্ষণ। নীরবতা ভেঙে উনি বললেন "স্যার কামরাঙ্গা খাবেন?"

"কামরাঙ্গা?" খুব অপ্রস্তুত ভাবে বললাম। "হ্যাঁ একদম টাটকা" বলতে বলতে পাঁচ-ছয়টা প্লাস্টিকের মধ্যে পুড়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। খুব ইতঃস্তত ভাবে জিজ্ঞেস করলাম "কত টাকা?" উনি হেসে

বললেন "টাকা লাগবে না স্যার। আপনি এসেছেন এটা অনেক বড় পাওনা। আমার মন্টুকে একটু দেখবেন। শিক্ষকের জায়গা অনেক উপরে।" আমি অবাক দৃষ্টীতে ওই দুটি প্রাণীর দিকে তাকিয়ে আছি। মহিলার চোখেমুখে অভাব-অনটনের দাগ কিন্তু মুখে খুব সাবলীল হাসি। অনেক বার অনুরোধ করেও কামরাঙ্গার টাকাটা দিতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম যে সম্মান উনি আমাকে দিয়েছেন সেটার মূল্য দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে, আর এই কামরাঙ্গা ফেরত দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। মন্টুকে জিজ্ঞেস করলাম চুমকির বাড়ি চিনিস? মাথা নেড়ে বলল সে চেনে। বললাম "নিয়ে চল আমাকে। হাতের কাজটা গুছিয়ে নে, আমি অপেক্ষা করছি।" অনুভব করলাম আমার নিজের অজান্তেই মনোজ আমার কাছে মন্টু হয়ে গেছে।

হেঁটে বাইকের কাছে গিয়ে দেখি কয়েকটা বাচ্চা আমার বাইকে চড়ে বসেছে। আমাকে দেখেই ওই শীর্ণকায় ছেলের দল দৌড় দিলো, আর তাদের কি উল্লাস। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্টু এলো। ওকে বাইকের পিছনে বসিয়ে চললাম চুমকি দের বাড়ি। ছোট ছোট হাত দিয়ে আমাকে ডিরেকশন দিতে লাগলো। গিয়ে পৌঁছালাম একটা জীর্ণপ্রায় ঝুপড়ির সামনে। বাইরে থেকে বাঁশের তৈরি দরজায় টোকা দিলাম। ভিতর থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। কোন বাচ্চা কাঁদছে। সাহস করে দরজাটা ঠেলা দিয়ে ঢুকলাম। চুমকি কোলে একটি বাচ্চা কে নিয়ে খাওয়াচ্ছে। অনুমান করলাম ভাই কিংবা বোন হবে। আমায় দেখে একটু অবাকই হয়েছে। আমি কিছু বলার আগেই বলল "স্যার এটা আমার বোন। আসলে মা কাজে যায় তো। আমি এলে তবে যেতে পারে বোনকে নইলে কে দেখবে। আর স্কুলে না গেলে ভাত খাওয়া হয় না"। অবাক হইনি খুব একটা এরকমই কিছু একটা আশা করেছিলাম। স্কুল থেকে আনা ভাত চটকে জল দিয়ে বোনকে খাওয়াচ্ছে। দশ বছরের একটি মেয়ের সাহসিকতা ও তার দায়িত্ব দেখে আমার মনে কেমন জানি একটা আলাদাই অনুভব এর সৃষ্টি হয়েছে। যেটা আগে কখনো হয়নি। বললাম, "ঠিক আছে কাল স্কুলে আসিস"। এই বলে আমি বেরিয়ে এলাম। লিস্টে এখনো দুজনের নাম। কিন্তু আমার আর সাহস নেই। এই পরিবেশ-পরিস্থিতি আমার কাছে এক ভিন্ন জগত। মন্টু কে বললাম "চল, তোকে বাড়ি ছেড়ে দিই"। মন্টুকে বাড়িতে ছেড়ে হাত ঘড়িতে দেখলাম বিকেল পাঁচটা বাজে। বাইক স্টার্ট দিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির দিকে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়েছে, পশ্চিমের আকাশটা রক্তকরবীর মতো লাগছে। আর আমার মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি। ভালো না খারাপ জানিনা। একটা দুপুর হয়তো

আমার জীবনের ইকুয়েশনটা বদলে দিল। পাল্টে দিলো দৃষ্টিভঙ্গি। পেটের খিদের যন্ত্রণা নিয়ে বইয়ের কঠিন পড়া বোঝার ক্ষমতা রাখে না ওই বাচ্চা গুলো। হঠাৎই একটা লাইন মনে পড়ল "পূর্নিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"।

চার যোগ তিন আট হলেও জীবনের অংক মেলানোর লড়াই চালাচ্ছে এরা। জানিনা কাল হেডস্যারকে গিয়ে কি বলবো, এও জানি না এদের স্কুলের গণ্ডীতে বেঁধে রাখতে পারব কিনা। কিন্তু মন বলছে যা হবে সব ভালো হবে। আমার মধ্যে এক অন্য অনির্বাণ কথা বলছে। না না "মাস্টারমশাই"। উঠানে বাইক টা রেখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মা কে বললাম" কামরাঙ্গা খাবে? একদম টাটকা।"

~~~ ~~~ ~~~
~~~

গৃহলক্ষ্মী

~ অঙ্কিত দাস

বর্ধমানের শক্তিগড়ের মেয়ে রিমঝিম, নামেই মতোই ভীষন মিষ্টি মেয়ে ছিল। তবে পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো না। বাবার বিঘা কতক জমি আছে আর তাতেই চাষ করে আর চাষের ফসল বিক্রি করে ওই কোনো ভাবে সংসার চলতো। আবার রিমঝিম হবার ৩-৪ বছর পর রিমঝিমের একটা বোন হয়। যদিও রিমঝিমের বাবা-মার ইচ্ছা ছিল ছেলের, কারণ মেয়ে তো বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে, কিন্ত একটা ছেলে থাকলে সে বাবাকে চাষে সাহায্যও যেমন করতে পারবে তেমনি পড়াশোনা করে চাকরি পেলে বাবা-মায়ের দুঃখও ঘোচাবে। যাই হোক ছোট বোন শিউলী হওয়ার পর সংসারের চাপ বেড়ে যাওয়ায় রিমঝিম-শিউলির মা একটা সেলাই মেশিন কেনে তাও অনেক ধার করে।বাড়তি রোজগারের আসায় মেশিন কিনে বাড়িতে বসেই গ্রামের মহিলাদের শাড়িতে পাড় বসিয়ে দেওয়া,ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জামা-প্যান্ট তৈরি,এসব করে বাড়তি কিছু রোজগার করে তার স্বামীর সংসার চালানো কিছুটা সুবিধা করে দেয়। অন্যদিকে রিমঝিমকে তার বাবা-মা অনেক কষ্ট সত্ত্বেও ওদের গ্রামের স্কুলেই ভর্তি করে দেয়।স্কুলে সে ছোট থেকেই প্রতিটা পরীক্ষায় প্রথম হতো আর পড়াশোনায় ভীষণ আগ্রহও ছিল!

তাছাড়া স্বভাব চরিত্রও বেশ ভালো ছিল আর স্কুলের ভালো ছাত্রী হওয়ায় সবাই ভীষণ ভালোবাসতো তাকে। তবে শুধু পড়াশোনায় না,রিমঝিমের হাতের কাজও ছিল ভীষণ সুন্দর।একবার স্কুলের কর্মশিক্ষার পরীক্ষার জন্য মাটি দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের একটা মূর্তি বানিয়ে,কর্মশিক্ষার পরীক্ষাতে প্রথম হয়েছিলো,আর সেই মূর্তিটা এতই সুন্দর হয়েছিল যে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ওই মূর্তিটাকে স্কুলেই রেখে দিয়েছিলেন যত্ন করে,আর প্রতি বছর বিবেকানন্দের জন্মদিনে ওই মূর্তিটাতেই ফুলের মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হতো।

রিমঝিমের মা-বাবা দুজনেই নানা কাজেব্যস্ত থাকার জন্য বাড়ির বড় মেয়ে হিসেবে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে বাড়ি অনেক কাজ তাকেই করতে হতো।খুব সকাল সকাল উঠে রান্না-বান্না ও বাড়ির কাজ করে, বোনকেও তৈরি করে দুজনই স্কুলে যেত। ফিরে আবার ঘরের সব কাজ করে সন্ধ্যেবেলা পড়াতে বসত

সাথে নিজের বোনকেও পড়ায় সাহায্য করতো।ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল যে, খুব ভালো করে পড়াশোনা করে বড় হয়ে একটা ভালো চাকরি করে বাবা-মা-বোনের সব দায়িত্ব সে নিয়ে নেবে। আর অত অভাব-অনটন সত্ত্বেও,সেভাবে কারোর সাহায্য ছারাই মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রিমঝিম ৮০%-র ও বেশি নম্বর পায় রিমঝিম।

কিন্তু যে পরিবারের ঠিক করে সংসার চালানোর মতোও রোজাগার হয় না, সেই পরিবারের পক্ষে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াটা তো একপ্রকার বিলাসিতা। বিশেষত আমাদের মতো দেশে দেশে শিক্ষা শুধুমাত্র তারাই পায় যাদের সেই সামর্থ্য আছে।এদেশে শিক্ষা-চাকরি সব ক্ষেত্রে বেশির ভাগই তো টাকার খেলা চলে। আবার ওই গরীব ঘরের সন্তান যদি মেয়ে হয়, তবে তো সে তার বাবা-মার ঘাড়ে বোঝার মত, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে চায়।

আর রিমিঝিমের ইচ্ছা থাকলেও তার বাবা-মার পক্ষে তাকে কলেজে পড়ানোর মত আর্থিক অবস্থাও ছিল না।আর তার উপর রিমিঝিমের বোনেরও পড়াশোনার খরচ আছে। এসব ভেবে তাই রিমঝিমের বাবা-মা তার অমতেই বিয়ে ঠিক করল। দেখতে-শুনতে ভালো আর সাংসারিক কাজকর্মেও বেশ পটু দেখে কলকাতার বাগবাজারের দত্ত পরিবারে বিয়ে ঠিক হয় রিমঝিমের। যদিও ১৮ বছরের ওই মেয়ে তখনও বোঝেনা বিয়ে কি জিনিস,তার সাথে বিয়ে হল ২৮ বছরের রাজীবের।

রাজীব দত্ত পরিবারের ছোট ছেলে একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে কাজ করে । বেশ ভালোভাবেই বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুর বাড়ি যায় সেখানে শ্বশুরের বড় বাড়ি, বড় বড় ঘর এসব দেখে রিমঝিমের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল বলে রাজীবই তার বউকে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। তবে বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে গিয়ে এক ঝলক দেখেই রাজীব, রিমঝিমকে ভালোবেসে ফেলেছিল,আর রিমঝিমের পড়াশোনা-হাতের কাজ আর তার স্বপ্নের ব্যাপারে জানতে পেরে, রাজীব চেয়েছিল বিয়ের পর সে তার স্ত্রীর সব স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করবে।

কিন্তু রাজীবের মা এবং বড় দাদা শ্যামল ছিলেন পুরোনো মানুষিকতার মানুষ,তারা মেয়েদের পড়াশোনা-চাকরি বাইরে বেরোনো, এসব একদম পছন্দ করতেন না। তারা সবসময় মেয়েদের দাবিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন। তাই শাশুড়ির নির্দেশে রিমঝিম আর তার বড় জা, মানে শ্যামলের স্ত্রী বিনয়ী সারাদিন দুজনেই শুধু সাংসারিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। দিনের পর দিন এইভাবে কাটতে থাকে কিন্তু রিমঝিম

তার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে করতে কোনোরকম এগোতে না পারায় প্রতিরাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।রাজীব তার স্ত্রীর কষ্ট বুঝতে পারতো আর নিজেও খুব কষ্ট পেত, কিন্তু তারও কিছু করার ছিল না।

সে চাইলেও মা-দাদার চোখ এড়িয়ে স্ত্রীকে পড়াশোনা করানো সম্ভব নয়।আর বিয়ের সময় রাজীবের মা রাজীবের শ্বশুর-শাশুড়িকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে বিয়ের পর রিমঝিম কোনোরকম পড়াশোনা-চাকরি করতে পারবে না। যদি এই কথার অমান্য রিমঝিম করে ,তবে তাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে আর রাজীবের আবারও বিয়ে দেবে।তাই কোনো ভাবে রিমঝিমের পড়াশোনার ব্যাপারে জানতে পারলে সেটা ভীষণ বিপদের হবে আর রাজীব জানত তার মা এককথার মানুষ আর বিশেষ করে বাড়ির বউদের উপর তার মায়া ছিল না সেভাবে।

এরপর বিয়ের পর প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীতে রাজিব রিমঝিমকে আদর করে জানতে চায় যে সে কি উপহার চায় তার থেকে! রিমঝিমের উত্তরে রাজীব ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। উপহার হিসেবে রিমঝিম রাজীবের কাছে সাহায্য চেয়েছিল তার বাকি পড়াশোনা শেষ করে ভালো একটা চাকরি পেতে।রাজীব অনেক ভেবে দু-একদিন পর ঠিক করে যে যাই হয়ে যাক না কেন সে রিমঝিমকে পড়াশোনায় সাহায্য করবে।তবু ভীষণ সাবধানে সাহায্য করতে হবে যাতে বাড়িতে কেউ জানতে না পারে।আর বাড়ি থেকে কলেজে পড়তে যাওয়া তো সম্ভব নয়, আর রিমঝিম পড়াশোনা করছে বাড়িতে জেনে গেলে তো ভীষণ বিপদ। তাই রাজীব তার স্ত্রীকে একটা কলেজের ডিসটেন্স কোর্সে ভর্তি করে দেয়, যাতে তাকে প্রতিদিন কলেজেও যেতে হবে না আর বাড়িতেও জানবে না কেউ।ভাবা মতোই কাজ,আর রিমঝিমের পড়াশোনা আবার শুরু হলো।রাজীবও অফিস থেকে ফিরে রিমঝিমকে পড়াশোনাতে কিছুটা সাহায্য করত।রিমঝিম প্রতিদিন খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়ে বাড়ির সব কাজ মিটিয়ে নিয়ে,সন্ধ্যে নাগাদ পড়তে বসে, আর তার স্বামী অফিস থেকে ফিরেও তাকে কিছুটা সাহায্য করে, এভাবেই চলতে থাকে রিমিঝিমি পড়াশোনা বাড়ির সবার অগোচরে।আর পরীক্ষার দিনগুলোতে রাজীব নানারকম কাহিনী বা মিথ্যে অজুহাত বার করে রিমঝিমকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে যেত তারপর তাকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যেত।সেই অজুহাতের মধ্যে যেমন ছিল, রাজীবের কোনো বন্ধুর বাড়ির অনুষ্ঠানে তাদের স্বামী-স্ত্রীর নিমন্ত্রণ আছে অথবা রিমঝিমের শরীর খারাপ বলে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে আরও কত কি।কিন্তু প্রতিটা মিথ্যে এতই সুন্দর ভাবে রাজীব বলতো যে বাড়িতে কেউ সন্দেহই করেনি কোনোদিন।এভাবে চলতে চলতে একদিন রিমঝিমের গ্রাজুয়েশন শেষ হল এবং সে first class degree নিয়ে গ্রাজুয়েশন পাস করল

আর ওদিকে তার শশুরবাড়ির কেউ টেরও পাইনি তার পড়াশোনার ব্যাপারে।সেদিন রাজীব,অতো ভালো রেজাল্ট করার জন্য রিমঝিমকে খুব সুন্দর একটা হাত ঘড়ি উপহার দেয়।অত ভালো রেজাল্ট আর খুব সুন্দর উপহারটা পেয়ে খুশিতে রিমঝিমের দুচোখ দিয়ে জল নেমে এলো, আর সে তখন তার স্বামীকে জরিয়ে ধরলো আর তার বুকের উপর মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করলো। অনেক চেষ্টা করে রাজীব তার স্ত্রীর কান্না থামাল।আর তারপর রাজীব রিমঝিমকে যে কথাটা বললে তার রিমঝিম স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ,রাজীব বলে রিমঝিম তার অগ্নিসাক্ষি করে বিয়ে করা স্ত্রীর, আর তাই স্ত্রী ভাত-কাপড়ের সাথে সাথে তার সুখ-দুঃখেরও খেয়াল রাখা আর তা পূরণ করা সবই স্বামীর হিসেব তার দায়িত্ব। আসলে রাজিবের পরিবার পুরনো মানসিকতার হলেও সে কিন্তু ছিল খুব আধুনিক মানসিকতার, সে মেয়েদের স্বাধীন-স্বাবলম্বী হওয়া টাকে ভীষন সমর্থন করত। তাই রাজীব বলে রিমঝিমকে তার এখনও একটা স্বপ্ন পূরণ বাকি আছে, তাই বসে থাকলে চলবে না হাজারো কষ্ট হলেও রিমঝিমকে তার স্বপ্ন পূরণ করতেই হবে।আর তার জন্য রাজীব তাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করতেও প্রস্তুত।

অন্যদিকে হঠাৎ করে রাজীবের বাবার হার্ডওয়ারের ব্যবসা, যেটায় এখন শ্যামল মানে রাজীবের দাদা দেখাশোনা করতো,সেটা বেশ কিছুদিন ধরে ক্রমাগত ক্ষতি হচ্ছিল।এভাবে চলতে চলতে কিছুদিন পর তো একদমই বন্ধ হয়ে যায় প্রায়।আর ব্যাবসায় লাভের যেটুকু বাড়িতে ছিল তাও খরচ হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই।আর এখন গোটা পরিবারের মানে দাদা শ্যামল ও তার স্ত্রী বিনয়ী,বাবা-মাএবং তার নিজের স্ত্রী সবার দায়িত্ব এসে পড়ে রাজীবের একার উপর।তাছাড়াও বাবার হার্টের অসুখের চিকিৎসার খরচ আর মায়ের বাতের ব্যাথার অষুধে খরচও আছে।হঠাৎ এত চাপ একসাথে রাজিবের মাথায় এসে পড়ায় ,রাজীব তার স্ত্রীকে আর পড়াশোনা সাহায্য করতে পারছিলো না। এমনকি সংসারের এমনই অবস্থা হয়েছিল যে, যে পরিবারের প্রতিদিন কত রকম পদের রান্না হত সে যেখানে মাছ-মাংস ছাড়া কোন দিন বাড়িতে রান্না হতো না সেখানে তাদের শুধু ভাত-ডাল খেয়ে কাটাতে হহচ্ছিলো।

এমন অবস্থায় রিমঝিম ঠিক করলো যে ও তার বড় জা মিলে একটা হোম ডেলিভারীর ব্যাবসা শুরু করে বাড়িতে রান্না করা সুস্বাদু খাবার বাড়ি বাড়ি অল্প দামে পৌছে দিয়ে আসবে।আর তার সাথে কিছু ছাত্রছাত্রী পড়িয়েও কিছু রোজগার করে বেশিরভাগ অর্থ সংসারে দেবে আর বাকি কিছুটা দিয়ে নিজের পড়াশোনা চালাবে। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলোতে কোনটাতেই রিমঝিমের শাশুড়ি এবং রাজীবের দাদা কেউ রাজি ছিলেন না। ওদিকে যতদিন পেরোতে লাগলো ওদের বাড়ির অবস্থা তত খারাপ হওয়া শুরু হলো।

অবশেষে কোনো উপায় না পেয়ে রিমঝিম রাজীবকে বলে সে যদি তার দাদা আর মাকে একবার বোঝানোর চেষ্টা করে। রাজীব তার দাদাকে প্রথমে বোঝায় যে তার একার পক্ষে এত বড় সংসার আর তার অত খরচ সম্ভব হচ্ছে না ,আর ডেলিভারির ওই ব্যাবসায় বাড়ির বউরা বাড়িতেই রান্না করবে আর তার দাদা ডেলিভারি করে আসবে সেই খাবার, তাই তার কথা মতো বাড়ির বউরা বাইরে বেরিয়ে কোনো কাজও করবে না। এভাবে অনেক করে বোঝাতে রাজীবের দাদা রাজি হলেন।আর তাই রাজীবের মাকেও রাজি করানোয় খুব অসুবিধা কিছু হয়নি। কিন্তু রিমঝিম যে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর কথা ভেবেছে,তা বলতেই রাজীবের দাদা-মা ভীষণ রেগে যান আর অনুমতিও দিলেন না। কিন্তু অবশেষে রাজীবের বাবা তার বড় ছেলে আর তার স্ত্রীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে প্রতিবাদ করেন এবং রিমঝিমকে পড়ানোর অনুমতি দেন।যদিও প্রথমে রাজীবের দাদা-মা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি কিন্তু রাজিবের বাবা আর রাজীব দুজনই ভীষণ ভাবে রিমঝিমকে সমর্থন করায় বাধ্য হন মেনে নিতে। এরপর জোড়কদম শুরু হলো খাবার হোম ডেলিভারির ব্যাবসা আর পাশাপাশি চলতে লাগলো রিমঝিমের পড়ানো।প্রথম দিকে ডেলিভারির ব্যাবসাটা বিশেষ ভালো না চললেও কিছুদিন পর থেকে প্রচুর খাবারের অর্ডার আসতে আরম্ভ করলো।আসলে তুলনামূলক অল্প দামে বিভিন্ন পদ রিমঝিম আর তার বড় জা মিলে রান্না করত আর রাজিবের দাদা অর্ডার মতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেগুলো পৌছে দিয়ে আসতো। রিমঝিম আর তার বড়ো জা দুজনেরই হাতের রান্না ছিল ভীষণ সুস্বাদু।তাই ক্রমশ খাবারের অর্ডার এতই বাড়তে থাকলো যে, রিমঝিম আর তার জা মিলে আর সামলাতে পারছিলো না।

অন্যদিকে সব কাজ সেরে বিকেলে রিমঝিম ছাত্রছাত্রীও পড়াতো, আর তার পড়ানো সবার এত ভালো লাগত যে ক্রমশ ছাত্রছাত্রী বাড়তেই থাকে। সারাদিন কাজ বিকালে পড়ানোর পর রিমঝিমের শরীর ভীষণ ক্লান্ত লাগতো কিন্তু শুধু মনের জোরে সে রাতের বেলা নিজের পড়াশোনা করত। আর হোম ডেলিভারি ব্যাবসা আর পড়ানো থেকে বেশ ভালো রোজগার হতে হতে দীর্ঘ দু'বছর পর দত্ত পরিবারের অবস্থা আগের মতই ভালো হয়ে গেল ,বলা চলে আগের থেকেও অনেক বেশি উন্নতি হয় তাদের আর্থিক অবস্থায়।এখন হোম ডেলিভারীর জন্য যেমন কর্মচারী রয়েছে তেমনি রান্নাও লোক দিয়ে হয়, রিমঝিম আর ওর জা মিলেই এখন গোটা ব্যাবসাটা দেখাশোনা করে।আর রিমঝিমের বুদ্ধিতেই যেহেতু পরিবারের অবস্থার উন্নত হয়েছে অত তাড়াতাড়ি, তাই রাজীবের দাদাও নিজের পুরোনো সব ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে।আর রিমঝিমের ব্যাবসায়িক বুদ্ধি ভীষণ ভালো দেখে তাদের পারিবারিক হার্ডওয়ারের ব্যাবসাটাকে

আবার সচল করার জন্য রিমঝিমের পরামর্শ নেন।আর সত্যিই রিমঝিমের পরামর্শ মতো চলে রাজীবের দাদা তাদের পরিবারের হার্ডওয়্যারের ব্যাবসাটার আরও উন্নতি ঘটায়।রাজীবও এখন চাকরি ছেড়ে ব্যাবসায় দাদাকে সাহায্য করে।এখন তাদের অবস্থা এতই ভালো হয়ে গেছে যে, বাগবাজারের বাড়ি ছেড়ে ,কলকাতার ধর্মতলায় বিশাল বড় একটা বাড়ি চলে আসে। পরিবারের এত উন্নতি, ওইরকম শুধু ডাল-ভাত খেয়ে কাটানো অবস্থা সবই সম্ভব হয়েছে রিমঝিমের জন্যই। এখন সারা কলকাতায় দত্ত পরিবারের নাম লোক মুখে ঘুরছে এত উন্নতি হয়েছে। আর এই সময়েই রিমঝিমিয়ে জীবনে এলো সব থেকে খুশির দিন। রিমঝিমের এত দিনের পরিশ্রম অবশেষে সফল হলো। রাজীব খরব আনে রিমঝিমের দেওয়া সরকারি চাকরির পরীক্ষার সে সফল হয়েছে। তাও যে সে পরীক্ষা না একদম WBCS পরীক্ষা, আর এই পরীক্ষাতে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। আর সেই আনন্দে রাজীব বাড়ির সবার জন্য কলকাতার সেরা মিষ্টির দোকান থেকে সেরা মিষ্টি নিয়ে এসেছে। বাড়ির সবাই ভীষণ খুশি হলেও রাজীবের মা যেন একটু অখুশি ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে রিমঝিম এতদিন বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে পড়াশোনা করে এসেছে আর এতে রাজীবও সাথ দিয়েছে। রিমঝিম ভীষণ খুশি হলেও সে বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দেয় তার শাশুড়ির অনুমতি ছাড়া সে কিছুতেই চাকরি করবে না,তাতে তার স্বপ্ন পূরণ না হলে না হবে। বাড়ির বাকিরা এমনকী রাজীবের দাদাও রিমঝিমকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন যে সে শুধু শুধু তার শাশুড়ির অনুমতির অপেক্ষা করে নিজের এত কষ্ট করে পাওয়া চাকরী আর তার স্বপ্ন দুটোই নষ্ট করছে কারণ তার শাশুড়ী ওই ব্যাবসায় আর পড়ানোর অনুমতি দিলেও বাইরে বেরিয়ে বাড়ির বউ চাকরি করবে এটা কিছুতেই মেনে নেবেন না।কিন্তু রিমঝিমও তার নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একটুও নড়বে না। এরপর রাজীব তার বাবা দাদা সবাই মিলে রাজীবের মাকে তার ওই পুরোনো নীতি বদলাতে অনুরোধ করে আর রিমঝিমকে চাকরির অনুমতি দিতে বলে, আরো জানায় যে রিমঝিম তার অনুমতি ছাড়া কিছুতেই চাকরি করবে না। এই কথা শুনে রাজীবের মায়ের খুব ভালো লাগলো এই ভেবে যে রিমঝিম তাকেও কতটা ভালোবাসে আর শ্রদ্ধা করে।আর পরের দিন সকালে খবরের কাগজে রিমঝিমের ওই wbcs পরীক্ষায় দ্বিতীয় হওয়া আর সাথে দত্ত বাড়ির বউ এইগুলো দেখে রাজীবের মা ভীষণ খুশি হন, তিনি বুঝতে পারেন রিমঝিমের জন্য আজ দত্ত পরিবারের নাম খবরের কাগজেও বেড়িয়ে গেল।এসব দেখে তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না।হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন আর রিমঝিমের প্রতি তার অবিচারের জন্য বার বার নিজেকে দোষারোপ করতে থাকলেন।অবশেষে রিমঝিম আসে তাকে সামলায়।

এরপর রাজীবের মা আদর করে রিমঝিমকে কাছে ডেকে নিলেন আর তাকে চাকরি করার অনুমতি দিলেন। আর স্বীকার করলেন যে তার ভাবনা ভুল ছিল, রিমঝিম প্রমাণ করে দিয়েছে মেয়েরা চাইলে ঘর-সংসার ও বাইরের কাজ সব একসাথে সামলাতে পারে।আর বলেন রিমঝিম আর বিনয় দুজনই হচ্ছে তাদের বাড়ির আসল লক্ষী, তিনি এতদিন তাদের চিনতে পারেননি, আর তাদের প্রতি তার করা সব অবিচারের জন্যে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।যদিও রিমঝিম আর বিনয়ী দুজনই বলে তাদের শাশুড়িকে যে বিয়ের পর এখন তিনিই ওদের মা,আর মা সবসময় মেয়দের ভালোই চান আর তিনি যদি একটু কড়া না হতেন তাহলে তারা সাংসারিক কাজে এত পটু হতে পারতো না। তাই উনি যেন ক্ষমা চেয়ে ওদের লজ্জা না দেন,বরং তারা রাজীবের মা ও বাবার আশীর্বাদ পেতে চায়। এই শুনে ভীষণ খুশি হয়ে রাজীবের বাবা-মা তাদের দু-বৌমাকে কাছে টেনে নেন আর অনকে আশীর্বাদ করেন।আর রাজীবের মা বলে আদতে রিমঝিমই হলো তার বাড়ির 'গৃহলক্ষী'।

এরপর রিমঝিম চাকরিতে যোগ দেয় আর নিজের স্বপ্ন পূরণ করে অনেক কষ্ট সত্ত্বেও।

সত্যি রিমঝিম আমরা প্রমাণ করলো মানুষ চাইলে কিনা করতে পারে,আবার এটাও প্রমাণ করল সংসার সুখের হয় রমনীর গুনে।

আর রিমঝিমের মতো মেয়েই তো আসলে রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী।।

~~~ সমাপ্ত ~~~
~~~

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

কলকাতা ও ট্রাম

~ সাগ্নিকা দাস

"চল রাস্তায় সাজি ট্রামলাইন ,

আর কবিতায় শুয়ে কাপ্লেট "-

কবিতা যদি কল্লোলিনী কলকাতার কণ্ঠস্বর হয়, ট্রামকে তবে তিলোত্তমার টাট্টুঘোড়া বলা যেতেই পারে। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ট্রামের ঘ্যাচঘ্যাচ শব্দ, বাঙালির মনের 'নস্টালজিয়া' -কে উসকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কলকাতার ঐতিহ্যের মুকুটে ,ট্রাম কিন্তু বরাবরই একটি উজ্জ্বল পালক হিসাবে বর্তমান আছে। ভাঁড়ের চা আর ময়দানের হাওয়া খেয়ে ফিরতি পথে একবার ট্রাম না চাপলে, কলকাতা পরিদর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । ভারত এবং সম্ভবত সমগ্র এশিয়ায়, কলকাতাই একমাত্র শহর, যেখানে বাকি পরিবহন ব্যবস্থার পাশাপাশি ট্রাম পরিষেবা এখনও স্বতন্ত্রভাবে বিরাজমান। সস্তা এবং খোলামেলা হওয়ার পাশাপাশি, টিভি এবং F. M রেডিও সম্বলিত এই যানবাহন বর্তমানে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছেও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

24 ফেব্রুয়ারি, 1873 সালে শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট স্ট্রীট অবধি 3.9 কি.মি রাস্তা ঘোড়ায় চড়া ট্রাম দিয়ে প্রথম কলকাতা ট্রামের যাত্রা শুরু। কিন্তু নানাবিধ কারণে সে বছরই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। 1880 সালে 22শে ডিসেম্বর, লন্ডনে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি (CTC) গঠিত হয়। সেই শতাব্দীর শেষের দিকে কোম্পানিটির অধীনে 166 টি ট্রাম গাড়ি, 1000টি ঘোড়া, 7 টি স্টীম লোকোমোটিভ ও 19 মাইলের ট্র্যাক চলে আসে। এরপর 1902 সালে বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রর্বতনের মাধ্যমে, কলকাতা ট্রাম ব্যবস্থার পুর্নজন্ম হয়। 27 মার্চ,1902 -এ এসপ্লানেড থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত ভারতের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চালিত হয়।

এরপর ধীরে ধীরে ট্রাম ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে কলকাতায়। এসপ্লানেড থেকে কালীঘাট, এসপ্লানেড থেকে শিয়ালদহ, বৌবাজার জাংশন থেকে বি. বি. ডি বাগ, ইত্যাদি বিভিন্ন নতুন ট্রামলাইনের সংযোজন হয়। 1946 সালে প্রথম যানবাহন হিসাবে হাওড়া ব্রিজ পার করার পর, কার্যতই শহরে ট্রামের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয়। কিন্তু সময়ের চাকা সদাই পরির্বতিত । শহরে আধুনিকতার হাওয়া লাগার সাথে সাথে, ট্রামগাড়ির স্বর্নযুগের অবসান ঘটতে থাকে। বহু ট্রামলাইন বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। কিছু বছর পর হাওড়া ব্রিজও (অতিরিক্ত ওজনের কারণে) ট্রামের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অবশেষে দ্রুতগামী মেট্রোর আর্বিভাবের ওপর, শহরবাসীর কাছে ট্রাম অনেকটাই ব্রাত্য হয়ে যায়।

বর্তমানে কলকাতায় 6টি ট্রাম ডিপোট - বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ,কালীঘাট, খিদিরপুর এবং 9টি টার্মিনাল - শ্যামবাজার, গালিফ স্ট্রীট, বিধাননগর রোড, বালিগঞ্জ স্টেশন, এসপ্লানেড, বি. বি. ডি বাগ, হাওড়া ব্রিজ ও নোনাপুকুরে একটি ওয়ার্কশপ রয়েছে। CTC -এর অধীনে রয়েছে মোট 257টি ট্রাম, যার মধ্যে 25 টি রুট দিয়ে 125টি ট্রাম প্রতিদিন চালিত হয়। মূলত, যে ধরনের ট্রাম গুলি এখন দেখা যায়, সেগুলা হল- ওল্ড SLC, SLC, নিউ SLC, আর্টিকুলেটেড SLC ,রেনোভেটেড SLC, নিউ কার, ও সিঙ্গল বগি। মাত্র পাঁচ - দশ টাকার বিনিময়ে, ট্রামগাড়ির বেঞ্চে বসে জানলা দিয়ে কলকাতার স্বাদ নেওয়া যে সস্তায় অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালির 'ল্যাদখোর' উপাধির সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে, শ্লথ গতির এই যানবাহন কিন্তু শহরের বুকে একটু অন্যরকম সময় কাটানোর জন্য খুবই উপযুক্ত। এছাড়া ট্রামের ঐতিহ্য বজায় রাখতে, শহর কলকাতার নতুন সংযোজন 'স্মরনিকা' ট্রাম মিউজিয়াম। মাত্র পাঁচ টাকা প্রবেশমূল্যের এই মিউজিয়ামে রয়েছে 'ক্যাফেটেরিয়া'-র পাশাপাশি প্রর্দশনী,যা দেখার পর ট্রাম সম্মন্ধে তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

যুগোপযোগী না হওয়া সত্ত্বেও, পর্যটক ও বহু সাধারণ মানুষের কাছে ট্রাম আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। কলকাতার ঐতিহ্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ট্রাম। যদিও মন্থর গতি ও যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটানোর দুর্নাম রয়েছে ট্রামের ওপর কিন্ত পরিবেশ দূষণের প্রেক্ষিতে ভাবলে, ট্রাম নিঃসন্দেহে একটি পরিবেশ-বান্ধব যানবাহন। এছাড়াও ট্রামগাড়ির অপর একটি উপযোগীতা হল এর বাসের থেকে বেশী জনসংখ্যা ধারণের ক্ষমতা। তাই সরকার, বহুবার ট্রাম পরিষেবা বন্ধ করার কথা ভাবলেও অবশেষে তা স্থগিত রেখেছে। সুখের খবর এই, বর্তমানে কলকাতায় ট্রামলাইন আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা চলছে। সঠিকভাবে সবকিছু বাস্তবায়িত হলে, আগামী দিনে শহরবাসী হয়ত নতুন রূপে ট্রামকে ফিরত পাবে।

প্রত্যেক শহরেরই কিছু নিজস্ব উপকরণ থাকে, যা সেই শহরকে স্বতন্ত্র করে তোলে। কলকাতার ক্ষেত্রে ট্রাম সেইরকমই একটা উপকরণ। ময়দান, ভিক্টোরিয়া, কলেজ স্ট্রীট -এসবের পাশাপাশি ট্রামগাড়িও পর্যটকদের কাছে কলকাতা ভ্রমণের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। প্রেমিক-প্রেমিকারা ,নিরিবিলি প্রেমালাপের ঠিকানা হিসাবে বহুকাল ধরেই ট্রামকে নির্বাচন করে আসছেন। তাই বাস-ট্রেন-মেট্রো-গাড়ি এসব কিছুর মাঝেও, কলকাতার হৃদয়ে ট্রাম চিরকালই স্বরাজকতায় বিদ্যমান থেকে যাবে।

অঙ্কন – অনিন্দিতা ভট্টাচার্য

অঙ্কন – অনিন্দিতা ভট্টাচার্য

অঙ্কন – দেবযানী ঘোষ

অঙ্কন – শ্বেতা কোলে

অঙ্কন – শ্বেতা কোলে

অঙ্কন – শ্বেতা কোলে

অঙ্কন – শ্রীময়ী ঘোষ

অঙ্কন – শ্রীময়ী ঘোষ

অঙ্কন - রিয়া সরকার

অঙ্কন – শ্রীময়ী ঘোষ

অঙ্কন – তান্নিষ্ঠা কারাতি

অঙ্কন – তান্নিষ্ঠা কারাতি

উদ্ভাবন
প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
ডিজিটাল পত্রিকা

... উপন্যাস ...

দিগন্ত রেখা

~ বৃষ্টি চৌধুরী

আসুন ফিরে দেখি: রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে । দুটো আলাদা জায়গা। একদিকে ল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, হিয়া, হার্দিক আর দেবিকা এবং অন্য দিকে আর্যদের পাড়া। ল-কলেজের অনুষ্ঠান শেষে হার্দিক , হিয়াকে নিয়ে গেল আর্যদের পাড়ায় । কি হবে ওদের জীবনে? কি আছে হিয়ার অতীতে? কি লুকানোর চেষ্টা করছে সবার থেকে আর্য?

... প্রথম সংখ্যার পর ক্রমশ ...

(৮)

পায়ে নিঁখুতভাবে পরা লাল আলতা , লাল লেগিংসের উপর একটু উঁচু করে পরা লাল পাড় সাদা শাড়ী আর কনুই পর্যন্ত নেমে আসা সাধারণ লাল ব্লাউজ , অন্য দিনের থেকে একদম আলাদা লাগছে আজ হিয়াকে। বছরের বাকি সবদিন তো কলেজের সাদাকালো ইউনিফর্মেই কেটে যায় ! অবশ্য আইন শিক্ষা থেকে কোর্ট- জীবন, এই সাদা কালো রঙেই জীবনের শান্তি খুঁজে নিতে হয় এই পেশার মানুষদের।রিহার্সালের কটাদিন যদিও নাচ আর নাটকের ছেলেমেয়েদের জন্য ইউনিফর্মের বাধানিষেধ থাকে না। তবে হিয়া তো হিয়া ই, সাজগোজের বালাই নেই , কোনো রকমে কিছু একটা পরে চলে আসে। তাই হয়তো আজকের এই পরিপাটি সাজে মেয়েটাকে দেখে আর চোখ সরানো যাচ্ছে না।

বাইকের লুকিং গ্লাস দিয়ে হেলমেট পরা হিয়াকে মাঝেমাঝেই আড় চোখে দেখতে দেখতে এইসবই টুকরো টুকরো কথা ভাবছিল হার্দিক।

- কিরে আজ এত আস্তে কেন? অন্যদিন তো জেট প্লেনের স্পিডে বাইক চালাস। আমার মনে হচ্ছে প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা পৌঁছাব।

কিছুটা মজার ছলেই হিয়া কথাগুলো বলল হার্দিককে।

- কি আর করব বল? পেছনে হবু 'উকিলসাহেবা'কে নিয়ে চালাতে গেলে এগুলো তো মাথায় রাখতেই হবে। না হলে এক্ষুনি আবার স্পিড লিমিট ক্রস করাটা কোন অ্যাক্টের কত নম্বর সেকশনে রয়েছে সেটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে আরম্ভ করবি। আপনার এই পড়া ধরার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যই এত সতর্কতা ম্যাডাম।
- জানি তো বলতে পারবিনা । "মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট" আমেন্ড করার পর নতুন লিস্ট বার করেছে বুঝলি? পাঁচ হাজার টাকা ফাইন আর তার সাথে তিন মাসের জেল হলেও হতে পারে।
- সত্যি রে হিয়া, ঐটুকু মাথায় এত কিছু রাখিস কি করে?
- রাখতে হয় নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়..বুঝলি??

হিয়ার কথায় হেসে উঠে গাড়ি চালানোয় মন দিল হার্দিক।

বাবা, মা, দাদা আর হার্দিক এই চারজনের ছোট্ট পরিবার ওদের। যদিও "ছোট পরিবার সুখী পরিবার" এর ধারণাটা ওদের বাড়িতে একেবারেই অচল। খুব একটা ভালো সম্পর্ক নেই হার্দিকের সাথে ওর বাড়ির লোকেদের। যদিও এই দুরত্বটা জেনে বুঝেই সৃষ্টি করেছে হার্দিক। ওর দাদা ওর থেকে বেশ কয়েক বছরের বড়। আর দু এক বছরের মধ্যেই বিয়ে করবে নিজের কলেজ জীবনের প্রেমিকাকে। বাবা সরকারি ব্যাংকের কর্মচারী ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন । আর দাদা, বাবার সুযোগ্য পুত্র হিসেবে এখন একটা বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজার। টাকা-পয়সার অভাব বাড়িতে না থাকলেও ছোট থেকেই হার্দিক বুঝতে পারত যে তার জায়গা বাড়িতে যেন ঠিক তার দাদার মত নয় । কিছুটা যেন অবহেলিত, কিছুটা যেন অবাঞ্ছিত। যদিও এই "অবাঞ্ছিত" শব্দটার প্রকৃত অর্থ অনেকদিন বাদে বুঝেছিল ও। হঠাৎ করে শুনে ফেলা বাবা-মায়ের কথোপকথনের টুকরো-টুকরো কথা থেকে বুঝেছিল যে ও এককথায় "আন ওয়ান্টেড – প্রেগন্যান্সি" এর ফসল। শারীরিক জটিলতার কারণে গর্ভপাত না করানো যাওয়ায় জন্ম হয়েছে আজকের হার্দিক মৈত্রর। আর তারপর থেকেই ওর মনে শুরু হয়ে যায় দাদার সাথে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা। তাই দাদার চাকরি করাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই আইন নিয়ে পড়তে শুরু করলো। কারুর চাকর হয়ে থাকবে না ও, নিজের মালিক নিজেই হবে। হ্যাঁ প্রাকটিস করবে । একজন সফল ক্রিমিনাল সাইড এডভোকেট হয়ে দেখিয়ে দেবে। বাড়ির লোকের সঙ্গে যতটা সম্ভব কম কথা বলে হার্দিক। বাইরের এই মজার, আমুদে, ছটফটে ছেলেটাকে দেখে কেউ মেলাতেই পারবেনা যে বাড়িতে ও ঠিক কী রকম। হিয়া যদি ও সব জেনে ওকে বলেছে যে ওর ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নাও হতে পারে , হয়তো ওর বাবা মায়ের দিক থেকে গল্পটা অন্যরকম। কিন্তু এতো বছর ধরে বয়ে চলা এই ধারণা, সে ঠিক হোক বা ভুল, হঠাৎ করে বদলে ফেলতে পারবেনা হার্দিক। সিগারেটের নেশার মতো রক্তে মিশে গেছে যে। আর এই হিয়া! গতবছর কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে হিয়া ব্যানার্জির একটা নাচ ওর জীবনটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এতদিন একই ক্লাসরুমে বসেছে কিন্তু কখনও আলাদা করে খেয়াল করেনি হিয়াকে। পড়াশুনায় বেশ ভালো হবার জন্য সবসময়ই ফার্স্ট বেঞ্চে বসে হিয়া, আর হার্দিকরা তাদের দলবল নিয়ে বরাবরই ব্যাকবেঞ্চারস। সেবার অনুষ্ঠানে তাদের সেমিস্টারকে নাচের গ্রুপ থেকে রিপ্রেজেন্ট করেছিল হিয়া আর সেই থেকেই এই হিয়া ব্যানার্জীর প্রতি এক অদ্ভুত ভালো লাগার শুরু হয়। তারপর আস্তে আস্তে মেলামেশা, কথা বলা, নোটস আদান প্রদান এর মাধ্যমে বন্ধুত্ব গভীর হতে শুরু

করে । প্রথম দিনই কথা বলতে বলতে হার্দিক নিজের জীবনের সবকিছু ওকে জানিয়ে দেয় আর মেয়েটাও কিভাবে যেন ওর ক্ষতগুলোকে নিজের অজান্তেই ভরাট করতে শুরু করে। সবকিছু বললেও নিজের ভালোবাসার কথা আজও বলতে পারেনি হার্দিক ওর হিয়ার মাঝে লুকিয়ে থাকা হিয়াকে।

বাইকটাকে একটা গলির মুখে এনে দাঁড় করালো হার্দিক।

- কীরে... নাম বাইক থেকে! পৌঁছে গেছি । মাইকের আওয়াজ পাচ্ছিস? গলিটা দিয়ে একটু হাঁটলেই প্রোগ্রামের জায়গায় পৌঁছাব।

  হেলমেট খুলতে খুলতে কথা গুলো বলছিল হার্দিক। পেছন ফিরে হিয়ার দিকে তাকাতেই চমকে উঠলো ও। সৌমেনদার হেলমেটটা হাতে ধরে থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা আর ঘেমেনেয়ে একাকার হয়ে গেছে। মাথায় লাগানো জুঁই ফুলের মালাটা রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে... বোধহয় হেলমেটটা খোলার সময় ই খুলে পড়ে গেছে ওটা।

- কি হয়েছে তোর? শরীর খারাপ করছে ? এরকম কাঁপছিস কেন? কি হলোটা কি?

- এই জায়গায় তোর অনুষ্ঠান? তুই এই জায়গাটা চিনিস? কিরে বল্?? এইখানে তোর অনুষ্ঠান?? বিস্ফারিত চোখে কথা গুলো কোনোরকমে বললো হিয়া।

- হ্যাঁ । এখানকার রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের কথাই তো তোকে বলছিলাম। কিন্তু কেন? বাদ দে.. ওসব পরে হবে। আগে তোর শরীরে কি হলো সেটা বল্।

হার্দিকের কোনো কথাই আর হিয়ার কানে পৌঁছাচ্ছিল না। ওর চোখের সামনে তখন স্লাইড শো এর মত ভেসে উঠছিল ওর বাড়ি, ওর বড় হয়ে ওঠার মুহূর্ত গুলো, ওর স্কুল, ওর বেস্টফ্রেন্ড, ওর আর্যদা আর সেই ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ টা!

- নাচটা খুব সুন্দর ছিল রে। অবশ্য নাচটা তুই খুব ভালোই করিস।

- থ্যাঙ্ক ইউ।

- আর কিছু বলবিনা? বাড়ি যাবি তো? তোর পাশের মেয়েটাকে বলছিলি যে খিদে পেয়েছে। চল বরং আমার বাড়িতে রাত্রিবেলা খেয়ে কাকুর খাবারটা নিয়ে বাড়ি যা।

- কোন প্রয়োজন নেই আর্য। বাড়িতে যাব, যা হোক কিছু একটা রান্না করবো, করে আমি আর বাবা খেয়ে নেব । তুই এখানে থাক, বাড়ি যা, যা ইচ্ছা কর।

- কেন এরকম করছিস বাবু? তুই কি আমাকে সত্যিই বিশ্বাস করিসনা? তোর মনে হয় এরকম একটা কাজ আমি করতে পারি? আগের দিন সব শুনে চুপ করে রইলি, তারপরে মাথা গরম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললি। তুই জানিস আমার শরীরটা কতটা খারাপ হয়েছিল? এই দুদিনের না কোন ফোন, না কোন মেসেজ ! কেন রকম করছিস তুই? মা আর তুই ছাড়া এখন অব্দি কেউ কিছু জানেনা এ ব্যাপারে। আমি কাউকে কিছু জানাতে চাইছিনা। তোকেই একমাত্র আমি ভরসা করে বললাম আর তুই আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিস এভাবে? আর শুধু এখন বলে নয়, তুই তো গত দু'বছর ধরে এরকম করে আসছিস। কেন করছিস এরকম? আমার উপর কি একটুও ভরসা নেই তোর?

- বাচ্চাদের মত করিস না আর্য। যে মানুষটা আমার সাথে চার বছর ধরে সম্পর্ক থেকেও কখনো সাহস করে আমাকে একবার জড়িয়ে পর্যন্ত ধরতে পারেনি, সে অন্য একটা অপরিচিত মহিলাকে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করবে আমি ভাবতেই পারিনা। এই বিষয়ে অ্যাট লিস্ট আমি তোকে কোন রকম সন্দেহ করছিনা। সব থেকে বড় কথা তোদের অফিসের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সেলে এটা প্রুফ হয়ে গেছে যে তুই নির্দোষ। সেখানে কেন আমি শুধু শুধু তোকে অবিশ্বাস করব?

– তাহলে কেন এরকম করছিস? বল আমায়।

– চাকরিটা কেন ছাড়লি? চাকরিটা ছাড়ার আগে একবার আমাকে জানানো পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিসনি তুই? তুই জানিসনা এই দু বছর ধরে কি কি চলেছে? আমার মা মারা গেছে। আমার বাবা শয্যাশায়ী। আমাকে একা হাতে সমস্ত কিছু করতে হচ্ছে। নিজের পছন্দের নাচটুকু আমাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দিতে হবে এরপরে। তুই তারপরে চাকরিটা ছাড়লি কি করে? তুই জানিসনা এখন আমাদের একটা আর্থিক নিরাপত্তার কতটা প্রয়োজন? সব জেনে শুনে তুই এটা করলি। যেখানে দুদিন পরে ভাত জুটবে না, সেখানে শুধুমাত্র অপমান হয়েছে বলে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার বিলাসিতা একমাত্র তুই দেখাতে পারিস। আমি চললাম। আমাকে এগিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

– একবার শোন। আমাকে একটু শোন। বুঝিয়ে বলতে দে অন্তত।

আর পিছনে না ফিরে দৃঢ় পায়ে বাড়ির দিকে হেঁটে যায় পামেলা। আর সেই আগুন ঝরানো পদক্ষেপের উত্তাপ পুড়িয়ে দিতে থাকে আর্যর হৃদয়ের অবশিষ্ট কোমলতাকে। ওর মনে পড়ে যায় চার বছর আগের অর্জুনরূপী পামেলা কে। সেদিনের সেই স্বল্পভাষী মেয়েটা আজ কতো কথা বলে গেল। কিন্তু আর্যকে কি আর একটু বুঝতে পারলো না ও? অনুষ্ঠান শেষের হইহট্টগোল ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো আর ধীর পায়ে আর্য এগিয়ে গেল বাড়ির পথে।

(১০)

সারাদিনের পরিশ্রমের জন্য মাথাটা একটু ঘুরে গেছিল – এই ছোট্ট মিথ্যে টুকু বলে কোনোরকমে হার্দিকের মনে জাগা প্রশ্নগুলো কে এড়িয়ে গেছিল হিয়া। হার্দিক কি বুঝেছিল জানে না ও , তবে অনুষ্ঠানের একদম শেষের সারিতে পাশে বসে শুধু শরীর কেমন লাগছে ছাড়া আর কোন কথা বলেনি ছেলেটা হিয়া কে। আধঘন্টা বসে চলে এসেছিল। হিয়াকে ওর হোস্টেলে নামিয়ে সৌমেনদা কে হেলমেটটা ফেরত দিয়ে চুপচাপ বাড়ি ঢুকে গেছিল হার্দিক। ওর এরকম চুপচাপ থাকাটা হিয়াকে বারবার কষ্ট দিলেও আজ নিজে থেকে একটাও কথা বলার মতো অবস্থাতে ছিল না

মেয়েটা। হোস্টেলে ফিরে চুপ চাপ জামাকাপড় বদলে নিজের বিছানায় বসে পড়লো হিয়া। ওর হোস্টেলের এই তিন জনের ঘরটায় ওর কোন সঙ্গী এখনও আসেনি। আর এই একাকীত্বটা যেন ওর কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু আজ যেটা হলো , যেখানে গেল , যা দেখলো ও, এর পর ওর জীবনে কি আবার কোনো ঝড় উঠবে? আস্তে আস্তে গুছিয়ে আনা জীবনটা কি আবার ওলোট পালোট হয়ে যাবে? এসব ভাবতে ভাবতে দেবিকাকে ফোন করার জন্য ফোনটা হাতে নিলো হিয়া। এই একটা মাত্র মেয়েই পুরো কলেজে ওর সত্যিকারের বন্ধু। এতো রাগ , অভিমান, খারাপ ব্যবহার সত্ত্বেও এই তিন বছরে ওর সঙ্গ ছাড়েনি। আর তাই ওর প্রতি অধিকার বোধ থেকে ওকে মুখের ওপর কথাও শুনিয়ে দিতে পারে যেমন , ঠিক তেমনই নিজের সমস্ত কিছু নির্দ্বিধায় বলতে পারে হিয়া। দেবিকাই একমাত্র মানুষ যে হিয়ার জীবনের সবকিছু শুনেছে আর কোনো প্রশ্ন না করে ওকে বিশ্বাস করেছে । তাই আজকের ঘটনার পর একমাত্র দেবিকাই আছে যাকে হিয়া সবটুকু বলে হালকা হতে পারবে। এইসব ভাবতে ভাবতেই দেবিকার নাম্বারটা ডায়াল করতে গেলো হিয়া আর সঙ্গে সঙ্গে হার্দিকের কল্ ঢুকলো ওর ফোনে। কি হলো ব্যাপার টা? রাত হয়ে গেছে আর রাতে তো হার্দিক চ্যাট করে , ফোন তো করেনা। তাহলে কি ওর বাড়ি পৌঁছাতে অসুবিধা হলো? নাকি অন্য কিছু? বেশী না ভেবে ফোন টা তুলে নিল হিয়া।

- কী রে? এখন ফোন করলি? বাড়ি পৌঁছেছিস?

- হ্যাঁ পৌঁছেছি। তারপর তোকে ফোন করবো বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি।
- কিন্তু কেন? আমরা তো চ্যাটেই কথা বলি।

- কারণ আমার কিছু কথা আছে হিয়া। যেটা চ্যাটে লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। আর বাড়ির লোক আমার পার্সোনাল ফোন কল শুনুক , সেটা আমি চাইনা।
- তা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবি আমার জন্য? আর তোকে আমি বারবার বলেছি তুই তোর বাবা মা এর সম্বন্ধে যেটা ভাবছিস সেটা ঠিক নাও হতে পারে। সব গল্পের দুটো দিক থাকে হার্দিক। তুই....

- আমি আমার ব্যাপারে কোনো জ্ঞান শুনতে ফোন করিনি। আর তুই জিজ্ঞেস করলিনা যে তোর জন্য বাড়ির থেকে বেরিয়ে এলাম কেন? তাহলে জেনে রাখ , শুধু বাড়ি থেকে বেরোনো নয় , তোর জন্য আরও অনেক কিছু করতে পারি আমি। এবার বল, আজ কি হয়েছিল? তখন আমি কোন কথা বলিনি যাতে তুই নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারিস। এবার বল।

- আমি তো বললাম সারাদিন ধকল গেছে, নিজের নাচ , সবাইকে রেডি করা , খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হয়নি তাই..
- তাহলে জায়গাটা দেখে ওরকম চমকে গেলি কেন? আমাকে জিজ্ঞেস করলি কেন যে জায়গা টা আমি চিনি কিনা?
- দেখ আমি এই নিয়ে কিছু বলতে চাই না । আমায় জোর করিসনা।
- কেন? আমার জীবনের সমস্ত কথা আমি তোকে বলেছি , তাহলে তোর জীবনের কথা আমি জানতে পারবোনা কেন?

- তারমানে তুই বলেছিস বলে আমায় বলতে হবে? তুই যা বলার নিজে থেকে বলেছিস্ , আমি জোর করিনি তোকে। আর আমার সাথে বন্ধুত্ব রাখার জন্য আমার অতীত জানাটা কি খুব জরুরি হার্দিক?

- হিয়ার বলা শেষ কথা টা শুনে অনেক ক্ষণ চুপ করে থাকলো হার্দিক। তারপর ধীরে ধীরে বললো,
- বেশ তোকে বলতে হবেনা অতীত নিয়ে কথা। কিন্তু এরপর তুই যদি নিজে থেকেও বলতে আসিস আমি কিন্তু শুনবোনা। আর হ্যাঁ... অতীত না জেনে তোর সাথে শুধু বন্ধুত্ব করেছি তা নয়, তোকে ভালোও বেসেছি। উড বি অ্যাডভোকেট হিয়া ব্যানার্জী, আই অ্যাম প্রোপোজিং ইউ .. আই লাভ ইউ। উইল ইউ বি মাইন?

হিয়ার সমস্ত শরীরের শক্তি হারিয়ে গেল কথা গুলো শুনে। আর্যদার পরে আর অন্য কোন ছেলে যদি হিয়ার মনের গোপন কুঠুরি তে প্রবেশ করে থাকে, তবে সে হার্দিক। কিন্তু আজ পাঁচ বছর পর যখন

আর্যদাকে দেখতে পেল, ঠিক সেদিনই হার্দিক ওকে প্রোপজ করলো? এবার ও কি করবে? কিছু কথা গুছিয়ে নিয়ে হিয়া বলতে গেলো

- হার্দিক শোন এভাবে...
- ইয়েস ওর নো। বারোটা বাজতে আর দু মিনিট বাকি। তার মধ্যে উত্তর দিবি। যদি না বলিস তবে জেনে রাখ আজ এই মুহূর্ত থেকে তুই আমাকে হারালি। যাকে ভালোবাসি তার সাথে শুধু বন্ধুত্বের অভিনয় করে আমি থাকতে পারবোনা। সো হিয়া , ইয়েস ওর নো?

শারীরিক আর মানসিক চাপে বিদ্ধস্ত হিয়ার স্নায়ু ওকে জবাব দিয়ে দিচ্ছিল। ক্লান্তস্বরে ও কোনো রকমে বললো, "ওকে, ইয়েস" । মাথার মধ্যে ওর শুধু এটুকুই ঘুরছিল যে নতুন করে আর কাউকে হারানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। হার্দিককে তো নয় ই।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে হার্দিক বলে উঠলো, " তবে এই রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন থেকে আমরা রিলেশনশিপে গেলাম। তুই শুয়ে পর। খুব টায়ার্ড তুই। বাই। লাভ ইউ। " তারপর ফোন টা কেটে দিল।

হিয়া জানলে হয়তো অবাক হতো যে ঠিক চার বছর আগে এই রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনই ওর জীবনের প্রথম পুরুষ আর্যদা নিজের জীবনের প্রথমাকে খুঁজে পেয়েছিল ।

------ ক্রমশঃ ------

ধর্মযুদ্ধ

~ স্নেহা কাঁড়ার

ধর্ম কিংবা জাতি
রাজনৈতিক হোক বা গনতান্ত্রিক,
হিংসা রটায় আপন দেশে
আপন মায়ের শত্রু যাচে ;
যেথায় নিন্দা ওঠে কবিগুরুর ।
নিজেদেরই দেশের মৃত্তিকাতে
বিভেদ যেথায় তুঙ্গে আজ
মরছে হিন্দু – মুসলমানে ,
পারিপার্শ্বিক অরাজকতায়
ভুলেছে মানুষ ভালবাসা
কোথায় দেশের সোনার বরণ !
কোথায় দেশের চাঁদের হাসি ?
সবই এখন দেশের মাঝে
বিদ্বেষ আর তর্কাতর্কি ।।

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

ভগবান নাকি বিজ্ঞান

~ কৌস্তুভ ঘোষ

এই জগত তো তোমার তৈরী, তবু কেনো তোমার এত বৈরী?

জগতে এত কষ্ট তবু তোমাকেই লোকে পুজে,

অপ্রাপ্তির ভাঁড়ার ভর্তি হলেও তোমাকেই তারা খোঁজে।

সত্যি আছো তুমি,নাকি মানুষের কল্পনা-

তোমার মহিমা কিছু না সব বিজ্ঞানের রচনা।

"আর কি কি তোর বলার আছে, আজ ই শুনতে চাই-

তারপর কিছু প্রশ্নের যেন খাঁটি জবাব পাই।"

তোমার আবার প্রশ্ন?তুমি জবাব আমায় দাও-

কিসে মিটবে খিদে, আর কত রক্ত চাও?

আজ ইবোলা,কাল কোরোনা কত নিত্যনতুন রোগ-

তুমি কি বলতে পারো তারা আর কি কি করবে ভোগ।

গুহায় বন্দি থেকেও ভাবত মানুষ তুমি সথেইআছো-

বন্দি ঘরে যাচিছে মানুষ কোথায় তুমি গেছ?

যুগে যুগে তুমি আসবে ফিরে বললে তুমি গীতায়-

কোরোনায় হয়ে অসহায়-প্রভু আজ গেলে তুমি কোথায়?

বিজ্ঞান আজ লড়ছে বাইরে, তুমি গর্ভগৃহে-

এবার বলো কবে আর তুমি আসবে মানবদেহে।

বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষ হবেই কোরোনা মুক্ত,

তখন আর কেউ পুজবে না আর হয়ে যে অভুক্ত।

“করিস না পূজা তবে, বল কাকে বলে তবে পূজা-

শিবজ্ঞানে জীবসেবা, সব জীবেই আমায় খোঁজা।

তোকে অভুক্ত রেখে কোনোদিন মা খেয়েছে নাকি কভু,

তোরা না খেলে কিভাবে তবে খাবে এই মহাপ্রভু।

ধর্ম মানে জীবকে যা ধারণ করে রাখে, ধর্ম যাকে আঁকড়ে মানুষ বাঁচতে শেখে।

ধর্ম মানে জানা-অজানা বিশেষ কিছু জ্ঞান-ধর্ম মানে মানবতা,ধর্ম তারই ধ্যান।

ধর্ম মানে নিজে ভালো থেকো, পরকেও রেখো ভালো-

ধর্ম যা কাটায় আঁধার, আনে জ্ঞানের আলো

ধর্ম মানে অনাড়ম্বর,ধর্ম ন্যায়ের প্রকাশ-ধর্ম মানে অন্তর্নিহিত দেবত্যের বিকাশ।

ধর্ম যে বিজ্ঞানের আরেক নাম,ধর্ম যেন রহস্য মোরা সুন্দর এক খাম।

ধর্ম কবে বলেছে অন্যের থেকে কাড়ো- বলেছে কি নিত্যনতুন রোগ আবিষ্কার করো?

ধর্ম নয় অনুকরণ যা আছে ধর্মগ্রন্থে-ধর্ম মানে এটুকু বোঝা আমি আছি জীবের মধ্যে।

আমি শক্তি,অনুপ্রেরণা,আমি কল্যাকারী-সকল কিছুর সৃষ্টি, স্থিতি, আমিই প্রলয় করি।

আমারই স্বরূপ পিতামাতা-তোরা তাকেও কষ্ট দিস;

খাবারেও তোরা মেশাস ভেজাল, কত রকমের বিষ।

তোরাই খুঁজিস গর্ভগেহে, আমি তো প্রতিটা জীবের দেহে।

জীবে প্রেম কর বললেও তোরা শুনেছিস কোনো কথা,

ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ে-মরে দিয়েছিস শুধু ব্যথা।

লোভের উদয়ে বাড়ে অসন্তোষ,ভরে অপ্রাপ্তির ভাঁড়ার-

নেবে আর নেবে, মিলবে না কিছু,জীবন যে ছাড়কার।

শক্তির স্ফুরনেই হলো সভ্যতার উন্মেষ,দ্বেষের প্রভাবে বানিয়ে যত নিত্যনতুন দেশ।

আমি শক্তি-যার নেই সৃষ্টি না আছে ধ্বংস;জীবজগত সব কিছুই তো আমারই অংশ।

যখন বুঝবি মানুষের ক্লেশ,দুঃখ, বঞ্চনা-মর্তেই হবে সুন্দর এক স্বর্গের রচনা।

~~~ ~~~ ~~~
~~~

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

ছিঃ, মানবিকতা

~ অর্ণব চক্রবর্তী

তুমি আজ অমানুষ
অভুক্ত মানুষের মরণ মুখ দেখোনি
দেখেছো অকাল দীপাবলি।
ছিঃ, মনুষ্যত্ব
তুমি আজ মৃতদেহ
টাকায় বড় হয়ে অট্টালিকায় বাঁচো
আধ পেটের হাহাকার বোঝোনি।
ছিঃ, সামাজিক জীব
ভাবোনি আজ তাদের কথা
যারা আজ করোনায় পরিজন হারা,
ছিঃ,মান হুঁশ
ভাবোনি মৃত্যু আসবে একদিন
তোমারও দরজায়,তোমার ঘরে
ফানুস ওড়াবে,থালা বাজাবে
আর বারান্দায় জ্বলবে মোমবাতি
ছিঃ, ছিঃ...
লজ্জা লাগে বেঁচে থাকতে
এই সমাজ, এই সভ্যতায়...

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

সবুজ পৃথিবী

~ শুভ বাঁক

এই পৃথিবীর রং নীল থেকে সবুজ হয়েছে আজ কয়েক শতাব্দী হল।
এখন আমাজনের জঙ্গল পানামা পেরিয়ে পাড়ি দিয়েছে টেক্সাসে।
হোয়াইট হাউসের রং আর হোয়াইট নেই!
সেখানে আজ লতাপাতা আর গুল্মের রাজত্ব।
সেবার যখন মানুষগুলো বিলুপ্তির পথে,
তখন থেকেই শুরু হয়েছিল,
প্রকৃতির এই অধিকার বুঝে নেওয়ার পালা,

এই কয়েক শতাব্দীতে আন্টার্টিকা সাদা হয়েছে আরও!
কোথাও কোন ধোঁয়া নেই, নেই কোন কোলাহল।
বরং সেখানে জন্ম নিয়েছে কয়েকটা সদ্যোজাত হিমবাহ!
সিডনি হারবার ব্রিজটা ভেঙে পড়েছে বেশ কয়েক দশক হল,
তাই বেচারা কাঙ্গারু গুলোর হয়েছে ভারী সমস্যা!
ওরা এখন সরাসরি ডাওয়েজ পয়েন্ট থেকে
মাইলসন পয়েন্টে আসতে পারে না ঘাস খেতে।

ওদিকে ভারী সুখের সময় কলকাতায়,
সেখানে এখন ডিসেম্বরে বরফ পড়ে!
আলিপুর থেকে সল্টলেক,
এখন রাজত্ব কায়েম করেছে বন্য লেপার্ডরা।

গঙ্গা হয়েছে আরও স্রোতস্বিনী,
মোহনায় নাকি দেখা মেলে হাঙ্গরেরও!!
বোটানিক্যালের বুড়ো বটগাছটার বিস্তৃতি ঘটেছে বি. কলেজ ছাড়িয়ে!
পশ্চিমে মুম্বাই এর মেরিন ড্রাইভ এখন পরিণত হয়েছে সার্ক ড্রাইভ এ,
মাঝে মাঝে সেখানে ছুটি কাটাতে আসে নীল তিমিরা।
তাজমহলে শেষ পায়ের ছাপ পড়েছিল কয়েক শতাব্দী আগে।
এখন যমুনার তীরে লড়াই চলে বন্য হরিণ আর কুমিরের।

এদিকে মস্কোর রেড স্কোয়ারে এখন শিকারে ব্যস্ত সাভানা ভাল্লুকেরা,
তাদের বিচরণ ক্ষেত্র এখন সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে নাইনথ্ ফোর্ট
কিমবা সেভেন সিস্টার্স।
চীনের পাঁচিলটা এখন আর দেখা যায় না মহাকাশ থেকে।
সেখানে এখন কেবল সবুজের সমারোহ।
বুহানে বসেছে বাস্তুতন্ত্রের কুম্ভমেলা,
সেখানে প্রতিদিন চলে শিকারী ও শিকারের রেনেসাঁ।
এই রেনেসাঁর জন্মভূমি ইউরোপ এখন পৃথিবীর স্বর্গ,
পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব বিদায় নিয়েছে কয়েকশো বছর হল।
তবুও তাঁদের তৈরি আইফেল টাওয়ারটা দাঁড়িয়ে আছে কিছু নিশান হাতে,
ও যেন কিছু বলতে চায় আগামীর সবুজ পৃথিবীটাকে,
ও দেখেছে মানুষের সমস্ত গাম্ভীর্যকে ধুলোয় লুটোতে,
ভীষণ দুর্যোগে দাঁড়িয়ে হয়তো ও বিদ্রূপ করেছিল সেই নিকৃষ্টতম ঔদ্ধত্যকে।

ইটালির গ্র্যান্ড ক্যানেলে এখন মেলা বসে হাজারো ফ্লোরা আর ফণার,
ভ্যাটিকান সিটির রাস্তাগুলো এখনো শান্তির কথা বলে
তবে তা মানুষের জন্য না,সেখানে বসে প্রকৃতির ধর্ম সম্মেলন।
এথেন্সের অ্যাক্রপলিস ভেঙেছে অনেক আগেই!
রোমের ভগ্নপ্রায় কলোসিয়াম এখন হাজারো পরিযায়ী পাখিদের নিশ্চিন্ত বাসস্থান।
আমাল্ফি কোস্টে রোদ পোহাতে আসে সামুদ্রিক-দানবেরা।
রয়েল ক্যাস্টেল মিউজিয়ামে টিকেছিল মানবজাতির শেষ আধারটুকু।
তা এখন পড়ে আছে হাজার বছরের নিদর্শন হয়ে।
ওদিকে লন্ডন স্কোয়ারে এখন উঠপাখিদের অবাধ আনাগোনা,
সঙ্গে রয়েছে শেয়াল, হায়না আর নেকড়ের সমাবেশ।

ভূমধ্যসাগর হয়েছে আরও বন্য, আরও উত্তাল!
সাহারা আর মরুভূমি নেই!
সেখানে এখন প্রায়ই বর্ষা নামে-
বেলে মাটি দখল হয়েছে ঝোপঝাড়ে।
গিজা পিরামিড এর চূড়ায় আস্তানা গেড়েছে শিকারী ঈগলের দল।
ভাল্লুকের পরিবার নিয়মিত মাছ ধরতে আসে ভিক্টোরিয়া ফলসে।
এখন ওদের আর ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।
নীলনদ তার গতিপথ বদলে সুদান থেকে সোজা মিশরের খার্গা হয়ে মিশেছে ভূমধ্যসাগরে।
ওদিকে আটলান্টিক পেরিয়ে আফ্রিকান পরিযায়ী পাখিরা পাড়ি দেয় সুদূর সাওপাওলো কিংবা রিও ডি জেনেরিও সমুদ্রতটে।
অ্যামাজনের পিরানহারাও ভুলে গেছে মানব রক্তের স্বাদ!
অবশ্য নায়াগ্রা ফলস গর্জন করে চলে আপন হিংস্রতায়।

পৃথিবী শেষ কবে কামানের শব্দ শুনেছে তা মনে নেই!
পরমাণু বোমা গুলো কবরস্থ হয়েছে বহুকাল আগেই।
বন্দুকের নল থেকে হয়তো পৃথিবীর শেষ বুলেটটা বেরিয়েছিল,
আত্মরক্ষার তাগিদেই।
অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকার সে কি ভীষণ চেষ্টা!
তবুও ওদের ক্ষমা করেনি প্রকৃতি!

কয়েক শতক আগেও যেখানে ছিল জাঁকজমকের ঘনঘটা,
সভ্যতার কোলাহল, পৃথিবীর তথাকথিত শ্রেষ্ঠ প্রাণীদের হাস্যকর দম্ভ,
প্রকৃতি যেন কোনো অদৃশ্য জাদু বলে দখল করেছে সবকিছু,
প্রতিশোধ নিয়েছে সেই নিকৃষ্টতম জীবের উপর,
আর ফিরবে না, হ্যাঁ এখন ডাইনোসরদের তালিকায় নাম লিখিয়েছে ওরা।
তবুও এখনও আকাশে বাতাসে মিশে আছে একটাই আক্ষেপের গান,
এই এতগুলো শতক পরেও পৃথিবীর এত সৌন্দর্য দেখবে কোন ভগবান??

~~~ ~~~ ~~~
~~~

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা

উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

হায় বাঙালি

~ অর্ণব চক্রবর্তী

শত আঘাতেও, ভাঙবে না তুমি

এমন পাষাণ মন

শত পদাঘাতে, কাঁদবে না তুমি

উচ্চ সম্মানবোধ

শত লাঞ্ছনায়, হাসবে আবার

চিত্ত বিকীর্ণ করে

শত গঞ্জনা,কালিমা বুকেতে নিয়ে

অবিরাম দাসত্বে

শত অবহেলায়, আপন করবে

বাঙালি মধ্যবিত্ত হয়ে ...

ছবি – মনোজিৎ দত্ত

ছবি – মনোজিৎ দত্ত

ছবি – মনোজিৎ দত্ত

ছবি - পলাশ দাস

Rays of hope

ছবি – কৌস্তভ চ্যাটার্জী

The divine flames

ছবি – কৌস্তভ চ্যাটার্জী

Eyes have its own words

ছবি – কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য

ছবি – অমৃতা পাল

ছবি – রাহুল দত্ত

ছবি – রাহুল দত্ত

ছবি – দীপন মজুমদার

আজ বাজে মনের মাঝে আগমনের গান
জগৎ জননী মাকে করি আহ্বান

" মা " আসছেন আবার ...

ঠিক রাত ১২টা। বেডসাইড ল্যাম্পটা একবার জ্বলছে একবার নিভছে। এক বৃদ্ধ গভীর চিন্তায় মগ্ন, ভাবছে এতদিনের দূর্গা পূজার কী ইতি এখানেই? উমা কী তার বাবার ঘরে আসবে না!!!!

হঠাৎ তার চোখে পড়ে তার দিকে একটা ছোট্ট মেয়ে এগিয়ে আসছে। পায়ে আলতা হাতে একগুচ্ছ পদ্মফুল। কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে "বাজলো তোমার আলোর বেণু,,,মাতলো রে ভুবন "। বৃদ্ধর কাছে এসে সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, মেয়ে আসবে বাবার কাছে এতে কোনো আড়ম্বর তো লাগে না। আর কোনো বাঁধাও এর মধ্যে আসতে পারে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, পৃথিবী সুস্থ হয়ে উঠবে আর মেয়েও বাবার ঘরে আসবে।

হঠাৎ বৃদ্ধর ঘুম ভেঙে গেল ।ঘড়ির কাঁটা বলছে তখন ভোর ৪ টে। তার তখন মনে পড়ে সবাই বলে ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়।

ছবি – দীপন মজুমদার

ছবি – দীপন মজুমদার

তোকে আলোর আলপিন দিতে পারি
তোকে বসন্তের দিন দিতে পারি
আমাকে খুঁজে দে জল ফড়িং।

ছবি – সম্বুদ্ধ সিনহা

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

উপহার

~ দেবকান্ত মাজী

শনিবার অফিসের পর যথারীতি বাসে করে বাড়ি ফিরছি । সময়টা দুপুর হলেও চারিদিক মেঘে অন্ধকার করে এসেছে। সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি হলেও এখন আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে শহরটা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেনিসে পরিণত হতে চলেছে। এই জুলাই মাসের দুপুরে কলকাতাকে কে যেন বৃষ্টির পাতলা ওড়না দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, চারিদিকের ট্র্যাফিকের শব্দের সাথে বৃষ্টির শব্দ মিশে একটা এমন ঝিমধরা সুর তুলছে যে মনটা নিমেষে শূন্যতায় ভরে যায়। বাসটা আজ এমনিতে ফাঁকাই আছে। একটা জানলার ধারের সিটে বসে বাইরে বৃষ্টিভেজা শহরটা দেখতে দেখতে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি ছুঁয়ে একটা হাই তুললাম। তারপর আড়মোড়া ভেঙে সামনের দিকে চোখ পড়তেই দেখি বাসের দরজা ঠেলে, ভেজা ছাতা হাতে নিয়ে উঠে এল গোলগাল, ফর্সা চেহারার এক ভদ্রলোক। বসার জন্য সে পিছনের দিকে আসতেই তার মুখের উপর আমার দৃষ্টি গেল আর আপনা থেকেই গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, "আরে মনোজ!"

মনোজ তার নাম শুনে হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই আমি হাত নাড়লাম। আমায় দেখতে পেয়ে ওর মুখে সেই চিরপরিচিত একগাল হাসি ফুটে উঠল, তারপর হন্তদন্ত হয়ে এসে আমার পাশের সিটে বসে পড়ে গদগদ হয়ে বলল, "আরে দেবু যে! কতদিন পরে দেখা ভাই! তা এসময় কোথায় যাওয়া হচ্ছে? অফিস-ফেরতা নিশ্চয়ই?"

আমিও যথাসাধ্য হেসে বললাম, "হ্যাঁ, ঐ আর কি! জানিস তো আমাদের এক্সিকিউটিভদের কাজ, স্পেশ্যাল মিটিং অ্যাটেন করতেই এই বৃষ্টি মাথায় নিয়েও ছুটতে হল। ঘরে বসে উইকএন্ডে এরকম বৃষ্টির দিনে আয়েশ করে যে খিচুড়ি, ডিমভাজা খাবো— তার আর কপাল কই?"

আমার ব্যাজার মুখে উত্তর শুনে মনোজ হাসতে হাসতে বলল, "জ্বালা কি তোর একার নাকি রে ভাই? এই দেখ্ না শাশুড়ি আজ রাতের ফ্লাইটে মুম্বই যাবে শালার কাছে, তো সেই জন্য ও বলে কিনা মায়ের সাথে দেখা না করে কিছুতেই যেতে দেবে না তাকে। যেন মা বনবাসে যাচ্ছে তাই শেষবারের মতো দেখা না হলে উনি আর দেখতে পাবেন না। ভাব তো, এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ওর শখ পূর্ণ করতে সেই

হাওড়া থেকে গড়িয়া যাওয়া কি মুখের কথা? অথচ, বিবাহিত পুরুষ তো, তাই ইচ্ছে না পূরণ করলে তখন দেখবো বৌ প্লাস শাশুড়ি দু'জনে মিলে একসাথে গলা টিপবে একেবারে"।

এই বলে মনোজ হাসতে হাসতে সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলো, "কই গো, এদিকে এসো! এখানে সিট আছে। ওখানে সব লেডিস ভর্তি তো!"

মনোজের দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাতেই দেখতে পেলাম একটি যুবতী কাঁধের লেডিস ব্যাগ সামলে স্খলিত পায়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। মাথার চুল পিঠের ওপর বিনুনি করা, চুড়িদারের ধূসর রঙের মধ্যে যেন বর্ষার সমস্ত সজল মেঘ এসে ভিড় করেছে, একখন্ড মাখনের টুকরো থেকে যেন কেটে নেওয়া হয়েছে এমন হাতের উপরে বৃষ্টির মিহি গুঁড়ো লেগে রয়েছে। মুখের দিকে চোখ তুলতেই তার চশমার কাঁচ ভেদ করে আমার দৃষ্টি হারিয়ে গেল দুটো আনত চোখের মধ্যে। সেখানে অনন্তকাল ধরে মনে হয় বর্ষা তার ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। হঠাৎ টের পেলাম, আমার বুকের ভেতরে আজকের এই জুলাইয়ের গন্ধ মাখা শহরের থেকেও একটা বিষণ্ণ, ধূসর ট্রেসিং পেপারে মোড়া জলছবি ক্রমশ জীবন্ত হয়ে উঠছে যেন। কত বছর পরে যেন সাহারা মরুভূমির বুকে লাগল স্নিগ্ধতার রং আর সেই স্বস্তির আবেশ ছড়িয়ে পড়ল আমার শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে কোষে।

সে সামনে আসতেই মনোজ পাশের রো-এর একটা ফাঁকা সিট ইঙ্গিত করে বলে উঠল, "এই তো এখানে ফাঁকা, বসো, ওদিকে কি করছিলে! আর এই দেখ মেঘা কে বসে আছে আমার পাশে, পুরো হঠাৎ দেখা একেবারে"! মনোজ আমার দিকে ফিরে হাসতে লাগল।

মেঘা সিটে বসে আমার দিকে চেয়ে মুখে কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, "আরে দেবু তুই! বাব্বা, কোথায় ছিলি এতদিন? আমি তো ভাবলাম বুঝি শহর ছেড়েই ভোকাট্টা হয়ে গেছিস। সেই যে বাবলির বিয়েতে দেখা হল, তারপর তো আর পাত্তাই নেই হ্যাঁ"! বলতে বলতে হাসির ঢেউয়ে আরও গভীর হয়ে উঠল মেঘার গালের টোলদুটো। সেদিকে চেয়ে ইচ্ছা করল হাতের মুঠোয় খানিকটা বৃষ্টির জল এনে ভিজিয়ে দিই ওইদুটো টোলের মসৃণ লাবণ্যকে।

আমি কোনোরকমে বেড়ে চলা হৃৎস্পন্দনটা সামলে নিয়ে বললাম, "আর পাত্তা! যা কাজের প্রেশার নিজেই না কোনোদিনও বেপাত্তা হয়ে যাই। সারাদিনের ধকল সামলে সোশ্যাল মিডিয়াতেই সেভাবে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়ে ওঠে না রে। সারাদিন খালি চরকির মতো ঘুরে যাচ্ছি"।

মেঘা ওর ভ্রুদুটো ঈষৎ বাঁকিয়ে বলল, "বিয়ে না করেই তুই চরকি হয়ে গেলি! তা এবার বিয়ে-টিয়ে হলে তো একেবারে রকেটের মতো আকাশে উড়বি রে, তখন তো আর মাটিটাই খুঁজি পাবি না"।

ওর কথা শুনে আমি আর মনোজ দু'জনেই হেসে উঠলাম। মনোজ দাঁত বের করে বলল, "তাও বিয়ে না করে কত সুখে আছে দেখ ও! অন্ততঃ এরকম বৃষ্টি মাথায় করে কারুর আবদার রাখতে ওকে ছুটতে হয় না। যেটুকু যায় তার জন্য কোম্পানি মাসের শেষে ওর অ্যাকাউন্টে টাকাটা ঠিক ভরে দেয়। আর আমায় দেখ, মন রাখতে জল ঠেঙিয়ে সেই গড়িয়া যাওয়া। ভালো করেছিস রে দেবু, একা আছিস কত ভালো! বিয়ে না করে বেঁচে গেলি"!

মনোজের শেষ কথাটা শুনে হাসিটা মুখে মিলিয়ে গেল কোথায়। মুখ ঘুরিয়ে জানলার বাইরে দেখলাম এতক্ষণে বেশ বৃষ্টি নেমেছে। তীরের ফলকের মতো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পিচের রাস্তার উপরে ঝরে পড়ে সুর তুলছে একটানা। রাজপথে নেমেছে সারি সারি রঙবেরঙের ছাতার ঢল। সিগন্যালের সামনে শুধু একটা রেনকোট পরা ট্র্যাফিক পুলিশ হাত নেড়ে জমে ওঠা যানবাহনের জটটাকে ছাড়াতে চাইছে। আমার বুকের মধ্যেও কি বৃষ্টি নামলো হঠাৎ? নইলে এরকম কেন মনে হচ্ছে আমার যে বহুদিন আগের কোনো চেনা স্মৃতি সোঁদা গন্ধের মতোই ফিরে আসছে আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে? পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া গাড়িগুলোর উইন্ডস্ক্রিন-ওয়াইপার কীসের জলছবি আঁকতে চাইছে আমার অনুসন্ধানী চোখের সামনে? বিয়ে না করে সত্যিই বেঁচে গেলাম কিনা— এই প্রশ্নটা মাথার মধ্যে সমস্ত চিন্তাভাবনার গতিকে স্তব্ধ করে তার উত্তরের খোঁজে তোলপাড় করা শুরু করছে স্মৃতিগুলোকে নিয়ে, আর আমার মনের পর্দায় একটু একটু করে ভেসে উঠছে কলেজে এম.এ ক্লাসের সেই ভর্তির দিনটা!

কলেজের চেনা গন্ডি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন, অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে পড়তে আসার জন্য স্বাভাবিকভাবেই একটা রোমাঞ্চ জাগছিল মনের মধ্যে। সেদিন আবার প্রথম দিন, ডকুমেন্ট ভেরিফিকশনের দিন ছিল, তাই একটু বেশিরকম নার্ভাস হয়ে ছিলাম হয়তো। কোনরকমে রুম নম্বরটা জেনে নিয়ে ধীর, অসংলগ্ন পায়ে নির্দিষ্ট হলঘরে এসে বসেছিলাম। চারিদিকে অপরিচিত ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ। কেউ নিজের চেনা-পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে গল্প করছে, কেউ নিজের ডকুমেন্ট ঠিক করতে ব্যস্ত, কেউ কেউ ফোনে আলাপচারিতায় মগ্ন, আবার কেউ বা আমারই মতো নিঃসঙ্গতার চাপে এদিক ওদিক ঘুরে দেখছে যদি সৌভাগ্যক্রমে প্রথমদিনই কোনো বন্ধু পায়! সামনে দু-বছরের একটা লম্বা জার্নি।

আর এভাবেই আমার প্রথম চোখ পড়েছিল আমার ঠিক পাশের রো-তেই বসে থাকা ওর ওপর। মনে হয়েছিল নার্ভাসনেসের থেকেও বেশি কিছু একটা মাথা তুলতে চাইছে আমার মধ্যে, নিমেষে যেন বুকের ভিতরে শুনতে পেয়েছিলাম একশোটা স্টিম ইঞ্জিনের একসাথে ধোঁয়া ছাড়ার শব্দ আর সেই ধোঁয়াতে ক্রমশ আবছা হয়ে গিয়েছিল আমার ভিতরের সময়ের ছোট্ট ঘড়িটা। আশেপাশের সব ছাত্র-ছাত্রীদের মুখগুলো আউট অফ ফোকাস হয়ে গিয়ে ওই একটা মুখেই আমার দৃষ্টি আটকে গেল। সে মনে হয় আনত চোখে মাটির দিকে কিছু দেখছিল, কি অদ্ভূত, শান্ত সে চোখের ভাষা! আমি ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলাম এই নতুন পরিবেশ, ভুলে গেলাম একটু আগের আমার রোমাঞ্চটা, ভুলে গেলাম আমার ডকুমেন্টগুলো ঠিক করে সাজিয়ে রাখতে। কানে ভেসে আসা সব শব্দগুলো কেমন যেন ম্লান হয়ে চোখের সামনে শুধু জেগে রইলো ওই একটা মাত্র মুখ যেটা দেখেই কি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য"? এত সুন্দর মুখ কারুর হয়? ওর কপালের উপর এসে পড়া পাতলা চুল, থুতনিতে খাঁজ আর গোলাপি আভাযুক্ত গালের দুটো গভীর টোল যেন প্রজাপতির মতো ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছিল আমাকে। কতক্ষণ সেই দমবন্ধ করা ভালোলাগার মধ্যে ছিলাম আমি জানি না। ক্লাসে সেদিন টিচার আসার পরে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম কিনা সেটাও ঠিক মনে পড়ে না।

এক বুক ভালোলাগা নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেই ঠিক করেছিলাম ওর সাথে আমাকে কথা বলতেই হবে, এই মেয়েকে ভালো না বাসতে পারলে তো জীবনটাই বৃথা যাবে! আসলে ভালোবাসা একটা সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতোই আমাদের হাড়ের নীচে লুকিয়ে থাকে। কখন-কীভাবে মাথা তুলে সে নিজের অস্তিত্ব জানান দেবে, তা আমাদের অনুমানের আওতায় পড়ে না। কাউকে ভালোবাসার জন্য দীর্ঘদিন দেখার প্রয়োজন নেই, এক মুহূর্তের বার্তালাপেও ভালোবাসা হতে পারে। নইলে "love at first sight" কথাটা কি এমনিই প্রচার পেয়েছে?

যাইহোক, পরেরদিন ইউনিভার্সিটি গিয়েই ওর সাথে আমি আলাপ জমিয়ে তুলি। অনেক সংকোচ কাটিয়ে ইতস্তত করে আমি কথা বলে জানতে পারি ওর নামটা। মেঘা! আমি নামটা শুনেই লাজুক ভাবে বলেছিলাম, "যে তোমার নাম দিয়েছে একদম সঠিক নাম রেখেছে। তোমার ঐ ভেজা ভেজা দুটো চোখ দেখে মনে হয় বর্ষার সজলতা যেন ভেসে বেড়াচ্ছে ওর মধ্যে। সত্যিই, মেঘের মতো ছায়া নামে যার চোখে সে তো 'মেঘা' হবেই! তোমাকে ঠিক যেন মনে হয়, "জুলাইয়ের মেয়ে", জুলাই মাসের মতোই তোমার মধ্যে বর্ষার স্নিগ্ধতা !

আমার শেষের কথাটায় খুব হেসে উঠেছিল মেঘা। হাসি তো নয়, যেন মেঘভাঙা রোদ্দুর! ও কি কিছু বুঝতে পেরেছিল আমার নিভৃত ইচ্ছা সম্পর্কে? মনে তো হয় না, তাহলে নিশ্চয়ই এতো হেসে কথা বলতো না হয়তো! তবে সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও খুব মিশুকে তবে গায়ে-পড়া স্বভাবের নয়। রূপ নিয়ে বিন্দুমাত্র অহংকারী তো নয়ই আর ভীষণ শান্তশিষ্ট, পড়াশোনাতেও বেশ মেধাবী। কথা বলতে বলতে আমাদের পরিচয়টা ক্রমশ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল, "তুমি"-র পরিবর্তে আমাদের কথাবার্তায় স্থান পেয়েছিল "তুই"!

এরপর থেকে মেঘার সাথে আমার যথেষ্ট ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ইউনিভার্সিটিতে আস্তে আস্তে অন্যান্য বন্ধু হতে শুরু করলেও আমার প্রথম বন্ধু হিসাবে তো বটেই, তার সাথে একটা অমোঘ আকর্ষণের পরিণতি হিসাবেও মেঘার সাথে আমি অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গভাবে মেশার চেষ্টা করতাম। যদিও মেঘার দিক থেকে সেভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া আসতো না। ও যেমন রেগে গিয়ে আমাকে দূরে সরাতো না, তেমনই প্রশয় দিয়ে ঘনিষ্ঠও হতো না। নোটস্ দেওয়া, লাইব্রেরিতে একসাথে বসে প্রোজেক্ট ওয়ার্ক কপি করা, অফ পিরিয়ডে ক্লাসে বসে সাহিত্য আলোচনা, ক্যান্টিনে বসে ডিমের চপ ভাগ করে খাওয়ার সময় যেমন আমাদের দেখা যেত ঠিক তেমনই ক্লাস শেষ হলে বিকালের নিভে আসা রোদ্দুরটুকু মাথায় নিয়ে আমি মেঘার সাথে হেঁটে বাসস্ট্যান্ড অবধি ফিরতাম। কখনও অসাবধানতাবশতঃ যদি ওর আঙুলের সাথে আমার আঙুলের ছোঁয়া লাগলেই আমি মৃদু লাজুক ভাবে বলে উঠতাম, "Your hand touching mine. This is how galaxies collide." মেঘাও ওর গালের দুটো গভীর উপত্যকাকে আরও গভীর করে তুলে হেসে উঠে বলত, "ওরে বাবা, ছায়াপথের সংঘর্ষ হলে সৃষ্টি বিপন্ন হয়ে যাবে তো রে! এত তাড়াতাড়ি টপকানোর ইচ্ছা কেন তোর"? আমি ওর হাসিতে সঙ্গ দিয়ে বাসস্ট্যান্ড অবধি আসতাম। তারপর ও বাসে উঠে বাড়ির রাস্তা ধরার পর আমিও যথারীতি আমার বাসে চেপে পড়তাম। অফিস-টাইমের গুঁতো, সাংঘাতিক ভিড়ের ঠেলা এসব সহ্য করেও আমি মনে মনে একটা ভেজা গন্ধ পেতাম, যেটা এতক্ষণ ধরে ওর পাশে হেঁটে চলার সময় আমি অনুভব করে এসেছি। গন্ধটা যেন আমার সাথেই চলেছে। আচ্ছা, জুলাই মাসের কি নিজস্ব কোনো গন্ধ থাকে নাকি সবটাই আমার নাকের ভ্রম?

কখনও মেঘার সাথে আমি যেমন কলেজস্ট্রিটে বই কেনার সঙ্গী হতাম তেমনই কখনও বা কফি হাউসের কফি, প্যারামাউন্টের শরবত অথবা দিলখুশা কেবিনের কবিরাজীর স্বাদও ভাগ করে নিতাম স্বাচ্ছন্দ্যে।

ও সাথে থাকলে আমাদের ইউনিভার্সিটি চত্বর জুড়ে ছড়ানো পুরো কলেজস্ট্রিট-টাকেই মনে হত যেন লন্ডন থেকে একটুকরো অক্সফোর্ড স্ট্রিটকে কেউ পরম যত্নে তুলে এনে রেখে দিয়েছে কলকাতার বুকে!

এভাবেই মাস-দুয়েক কেটে গেল। আমার ভিতরের কথাটা এবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বাইরে আসার জন্য। এর আগে মেঘা-কে সামনে থেকে বলতে গিয়েও থমকে গেছি বার কয়েক। কিন্তু আর এভাবে কতদিন চেপে রাখবো নিজের ইচ্ছাটাকে? ফ্রেন্ডজোন ছেড়ে লাভজোনে যাওয়ার পারমিট কি আর আদৌ পাবো না আমি? ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি আমাদের ডিপার্টমেন্টের কিছু ছাত্র মেঘার পিছনে পড়েছে, সবসময় তাদের আচরণের মাধ্যমে যেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইছে ওর কাছে। এভাবে চললে তো মেঘাকে আমার চোখের সামনে অন্যের হাতে হাত রেখে ঘুরতে দেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না। কিছু একটা করে এবার ওকে বলতেই হবে আমায়। কাউকে ভালোবাসা তো আর অপরাধ নয়। আমার ভিতরের তাড়নাটাকে আর বেশিদিন চেপে রাখা যাবে না, যেতে পারেনা!

সেই টিচার্স ডে-টার ছবি আমি আজও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেদিনও বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল সকাল থেকে। রাস্তার হাঁটুজল ঠেলে তাও ইউনিভার্সিটিতে উপস্থিত হয়েছিলাম। তার কারণ যতটা না কালচারাল প্রোগামে অংশগ্রহণ করা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল মেঘাকে পুরোটা বলে দেওয়া। ইচ্ছা ছিল দুপুর দু'টোয় প্রোগাম শেষ হয়ে বেরোলে ওকে একগুচ্ছ গোলাপফুল দিয়ে কথাটা বলেই দেব। সেইমতো আসার পথে অনেক কষ্টে গোলাপ সংগ্রহ করে এনেছিলাম। হন্তদন্ত হয়ে গ্যালারি রুমে ঢুকে একদিকে ফাঁকা সিট দেখে বসে পড়লাম। সামনে ছোট মতো মঞ্চ করে সেখানে অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছে। আজ বেশিরভাগ ছেলেরাই পাঞ্জাবী ও মেয়েরা শাড়ি পরে এসেছে। তাদের উচ্ছ্বসিত কথাবার্তায় বিশাল গ্যালারি রুমটা গমগম করছে বেশ। কিন্তু এতসব আয়োজন, রংবেরঙের পোশাক ও কথাবার্তার মাঝেও আমার অনুসন্ধানী চোখদুটো কেবলই খুঁজে চলেছে আমার "জুলাইয়ের মেয়ে"-কে। ঘাড় ঘুরিয়ে সামনের সারিতে তাকাতেই দেখতে পেলাম ওকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সীমাহীন মুগ্ধ আবেশ যেন ছেয়ে ফেলল আমার সর্বাঙ্গ। ওই তো ধূসর রঙের শাড়ি পরা, যেন মেঘে-জলে মাখামাখি হয়ে বসে রয়েছে মেঘা।গল্প করছে ওর পাশের মেয়েটার সাথে। পিঠের উপর বাঁধা বিনুনীতে রজনীগন্ধার তোড়া। মনে হচ্ছে দূর থেকেও যেন গন্ধটা ভেসে এসে তার মোলায়েম স্পর্শসুখ দিয়ে যাচ্ছে আমার চোখে-মুখে। মেঘা মনে হয় আমাকে দেখতে পায়নি, আমিও আর ওকে ডাকার কোনো চেষ্টা করলাম না। খালি অনুষ্ঠানের ফাঁকে

ফাঁকে কতবার যে ওর দিকে চেয়ে দেখছিলাম তা মনে হয় জানতে পারলে ও একবার হলেও আমার দিকে পিছন ফিরতো ঠিক!

সারাটা অনুষ্ঠান জুড়ে যে কি হল, কে কি বক্তব্য রাখল তা একটুও লক্ষ্য করিনি আমি। আমার চোখের সামনে মেঘার মুখটা আর মনের ভিতরে সেই না-বলা তিনটি শব্দ ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে উঠছিল। ঘোর ভাঙলো অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে যখন গ্যালারি রুম ছেড়ে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে একে একে। আমিও উঠে পড়ে বাইরে এলাম। এখনও বৃষ্টি চলছে সমান তালে। মেঘাকে দেখতে পেলাম করিডর দিয়ে একাই হেঁটে যাচ্ছে। এই আমার সুযোগ ভেবে ভিড় ঠেলে কোনোরকমে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর পাশে। আমায় দেখতে পেয়েই মেঘা বলে উঠল, "আরে দেবু কোথায় ছিলি রে? দেখতে পেলাম না তো! ভাবলাম বুঝি আজ বৃষ্টির জন্য আসবি না, তাই একাই বাসস্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়াচ্ছিলাম।"

আমি উত্তেজিত ভাবটা কোনোরকমে লুকিয়ে হেসে ফেলে বললাম, "আরে না রে! তোর পিছনেই ছিলাম তো। এত জনের মধ্যে আমাকে আর দেখতে পাসনি হয়তো!" তারপর একটা ঢোঁক গিলে একটু স্বাভাবিক হতে হতে বললাম, "মেঘা, তোর সাথে একটা কথা ছিল, মানে তোর কি সময় হবে? তাহলে একটু ফাঁকা দেখে বলা যেত!"

মেঘা ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে বলল, "কি কথা রে? খুব প্রাইভেট? মানে এখানে যেতে যেতে কি বলা যাবে না?" আমি ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাতে ও বলল, "তাহলে চল, ফার্স্ট ফ্লোরের করিডর তো মোটামুটি ফাঁকা আছে, ওখানেই শুনবো। কিন্তু দেখিস, বেশি দেরী করিস না কেমন! বৃষ্টির জন্য যা অবস্থা, দেরী করলে মা ফোন করে করে পাগল করে দেবে।"

আমি সেই মতো মেঘার সাথে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ফাঁকা করিডোরটায় দাঁড়ালাম। তেমন কেউ নেই, শুধু দু-একজন ছেলেমেয়ে এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে গল্প করছে। বারান্দা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বাইরেটা পুরো বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। কার্নিসে একটা ভেজা চড়াই পাখি বসে মুখ নামিয়ে নিচের দিকে কি যেন দেখছে। আমার বুকের ভিতর থেকে মনে হচ্ছে যেন হৃৎপিন্ডটা লাফিয়ে বাইরে চলে আসবে এক্ষুণি, হাতের চেটোতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। পা-দুটোও ঈষৎ কাঁপছে যেন। আমাকে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে থাকতে দেখে মেঘা বলে উঠল, "কি রে বল, কি বলবি বলছিলি! ভুলে গেলি নাকি? অমন ভাবে চুপ করে গেলি কেন হঠাৎ?"

আমি ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে বের করে আনলাম রুমালে মোড়া গোলাপের গুচ্ছটা। রুমালটা আমার খুব প্রিয়, ঠাকুমা নিজের হাতে সেলাই করে বানিয়ে দিয়েছিল আমাকে। সাদা রুমালটার উপরে নীল সুতোর কাজে ফুটিয়ে তোলা একটা টিনটিনের মুখ। টিনটিন আমার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র ছোটো থেকেই, এখনও আমি তার অন্ধ ভক্ত। সেই জন্যই ঠাকুমা গতবারের জন্মদিনের সময় নিজে হাতে আমায় উপহার দিয়েছিল এটা। আর আজ এই রুমালটা দিয়েই গোলাপগুলো মুড়ে মেঘাকে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল যাতে গোলাপের কাঁটা ওর আঙুলে কোনো ক্ষত সৃষ্টি না করতে পারে। আমি যদিও সব কাঁটা ভেঙে দিতে বলেছিলাম তবুও তাড়াতাড়িতে যদি দু-একটা থেকে গিয়ে থাকে আর সেটাই যদি আমার গল্প শুরু হওয়ার আগে শেষ করে দেয়— সেই কথা ভেবেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। আমি রুমালে মোড়া গোলাপগুচ্ছটা হাতে নিয়ে ওর সামনে দু-হাতে ধরে কোনোরকমে থেমে থেমে বললাম, "মেঘা, মানে ইয়ে বলছিলাম কি.. আমি তোকে বন্ধুর চেয়েও অনেক বেশি কিছু মনে করি রে। প্রথম দিন তোকে দেখার পর থেকেই ভাবছিলাম বলব, কিন্তু আশঙ্কা কাটিয়ে তোকে বলে উঠতে পারিনি আসলে।... আমি তোকে অনেক ভালোবাসি, তুই কি.. তুই কি আমার কথা বুঝতে পারছিস? মানে, এটুকুই তোকে বলার ছিল যে উইল ইউ বি মাই সোল-পার্টনার ফরেভার?"

এটুকু কোনোরকমে বলে আমি আস্তে আস্তে চোখ তুলে দেখলাম ওর মুখে। হাসিটা ওর কোথায় মিলিয়ে গেছে যেন আর ভ্রুদুটো কপালের উপরে বেঁকে উঠতে চাইছে। গালদুটো লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। ওর বড়ো বড়ো দুটো সজল চোখের ভিতরে মেঘের ছায়া আরও ঘন হয়ে এল কি?

মেঘা হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে রুমালে মোড়া গোলাপগুচ্ছটা নিল। তারপর শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে আস্তে আস্তে বলল, "ভালোবাসা ব্যাপারটা খুব সোজা তাই না রে, দেবু? জীবনে বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার মধ্যে সীমারেখাটাকে চিনতে শেখ্। আমি তোকে নিজের খুব ভালো বন্ধু মনে করতাম, প্রথমদিন আলাপের পর থেকে একমাত্র তোর সাথেই আমার এতোটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কিন্তু তুই মনে হয় একটু বেশিই ভেবে ফেলেছিলি যেটা আমি বুঝতে পারিনি! আমি স্বপ্নেও কোনোদিনও তোর থেকে এমন আচরণ আশা করিনি রে। বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা অনেক আলাদা..তুই এভাবে আমায়...!" বলতে বলতে শেষের দিকে মেঘার গলাটা কেমন যেন ধরে এল আর ও রুমাল-সমেত গোলাপের গুচ্ছটা আমার চোখের সামনেই ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচের বাগানে।

আমার বুকের মধ্যে বাইরের বৃষ্টির চেয়েও ভারী বর্ষণ শুরু হয়েছে ততক্ষণে আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গলার সামনেটা কেঁপে কেঁপে উঠছে বারবার। ভিতরের মেঘভাঙা বৃষ্টিটার জল চোখ ঠেলে বাইরে এসে জানাতে চাইছে তার তীব্রতা। আমি কিছু বলার জন্য ঠোঁটটা ফাঁক করতে চাইলেও পেরে উঠলাম না, কে যেন আমার দুটো ঠোঁটকে একসাথে সেলাই করে দিয়েছে মনে হল। আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই মেঘা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেল সিঁড়ির দিকে। আমি হতভম্ব হয়ে একা দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম সিঁড়ির মুখে মেঘরঙা শাড়ির সাথে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল আমার "জুলাইয়ের মেয়ে"! আর রেখে গেল শুধু তার চুলে বাঁধা রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধটাকে, সেটা তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে সমগ্র করিডোর জুড়ে!

ও চলে যেতে বারান্দার ভেজা কার্নিশে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। কানের মধ্যে বৃষ্টির শব্দের কম্পাঙ্কটা হঠাৎ করে বেড়ে উঠেছে যেন। নীচের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে আছে গোলাপের লাল পাপড়িগুলো। আর রুমালের মধ্যে থাকা টিনটিন ভিজে যাচ্ছে ক্রমশ। সে যেন আমারই মতো একা!

"কি করে দেবু, কি ভাবছিস এতো? জলের ঝাপটায় তোর প্যান্ট ভিজে গেল তো! জানলার শার্সিটা তুলে দে"। মনোজের কথায় সম্বিত ফিরে এল আমার। সত্যিই তো, স্মৃতিচারণায় এতোটা মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে বৃষ্টির ছাঁটে থাইয়ের উপরটা পুরো ভিজে গেলেও লক্ষ্যই করিনি আমি। বাইরে শহরটাকে কে যেন একটা ফোয়ারার পেটের মধ্যে রেখে দিয়েছে। সিটের পাশে জল চুঁয়ে চুঁয়ে ঢুকছে। বাসের জানলার শার্সিটা আমি টেনে তুলে দিলাম।

পকেট থেকে রুমাল বের করে হাতের জল মুছতে মুছতে শুনতে পেলাম মনোজের প্রশ্ন, "তারপরে বল্, তোর মা-বাবা সব কেমন আছে? বাড়ির খবর সব ভালো তো নাকি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ ওই আর কি! সকলেরই তো জানিস শরীর খারাপ আর অসুস্থতা নিয়ে বেঁচে থাকা এখন। 'ভালো থাকাটাই' এখন যেন একটা মিথ হয়ে গেছে। সকাল থেকে উঠে রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত খালি হাজারটা সমস্যা আর ওষুধনির্ভর জীবন। মায়ের এমনিই ঠিকই শুধু ঐ মাঝে মাঝে আর্থারাইটিসের ব্যাথাটা বাড়লে বেশ নাকাল হতে হয়!"

মনোজ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই জন্য তোকে বলছি তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে নে তো! ভালো চাকরি করিস, স্বচ্ছল পরিবার — তোর আর সমস্যা কি? বাড়িতে বৌ আনলে দেখবি মায়ের উপর প্রেশারটা তখন খানিকটা কম পড়বে। একা হাতে কি আর সব পেরে ওঠা যায় বল তো?"

আমি মুখ নামিয়ে হাসি গোপন করে বললাম, "এই তো খানিক আগেই বললি যে বিয়ে না করে নাকি বেঁচে গেছি। এখন আবার উলটো কীর্তন শোনাচ্ছিস কেন? তোর মতো শাশুড়িভক্ত হনুমান করে তোলার ইচ্ছা আছে নাকি আমায় ?"

মনোজ হালকা ভাবে বলল, "আহ:! সার্কাজম আর রিয়েলিটির মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে শেখ! ওটা তো আমি এমনিই বলছিলাম তখন, কিন্তু তোর বয়স একটু বাড়লেই বুঝবি যে একটা হেল্পিং হ্যান্ডের কতখানি দরকার জীবনে!"

আমি মনোজের কথায় মনে মনে হেসে উঠলাম। আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে ঠিক এমনই একটা বাদলের দিনে দাঁড়িয়ে একজন আমায় বলেছিল, "ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের পার্থক্যটা বুঝতে শেখ!" আর আজ মনোজ! সত্যিই, জীবনে দুটো আপাত সদৃশ ঘটনার মধ্যে পার্থক্য করাটা যেন কত শক্ত! অনেকেই হয়তো পারেনা। আমিও পারিনি যেমন। ওই দিনের ঘটনাটার পর থেকে আমি আর মেঘার চোখের দিকে তাকাতেও সাহস পাইনি। পরবর্তী বছর দেড়েক ধরে ক্লাসে যতবার দেখা হয়েছে বা কথা বলার প্রয়োজন হয়েছে আমরা নিতান্তই ভদ্রতাবশে দু-চারটে কথা বলে এড়িয়ে গিয়েছি একে অন্যকে। ব্যর্থতার সম্মুখীন হওয়ার পর বাস্তব থেকে পালাতে চাওয়াটা কিছু মানুষের মজ্জাগত হয়ে যায়।

আমাদের কথা শুনে ও-দিকের সিট থেকে মেঘা মুখ খুলল এতক্ষণে । অভিমানের সুরে বলল, "আমার বিয়ের পর থেকে তো তোদের ব্যাচটার কারুর সাথেই যোগাযোগ আর হয় না তেমন। সেই যে বিয়েতে তোরা শেষ এলি, তারপর থেকে তো সবাই কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এখন রাস্তায় মাঝেমধ্যে কোনো ব্যাচমেটের দেখা হলে ওই টুকটাক কথাবার্তা হয়, এই পর্যন্ত। সবাই তো নিজের নিজের জীবনের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত। পুরানো বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখার স্পেসটাই যেন ন্যারো হয়ে গেছে অনেক।"

মেঘা কথাটা হয়তো ভুল কিছু বলেনি। পাশ আউট হওয়ার বছর দু'য়েক পরেই খবর পেয়েছিলাম মেঘার বিয়ের ঠিক হয়েছে। মনোজ একটা মেডিকেল ফার্মে ছিল তখন, আমাদেরই সমবয়সী। বেশ নিরীহ,

ভালোমানুষ চেহারা। ওদেরই কীরকম যেন আত্মীয় হয়। প্রথমে বিয়েতে যাবো না যাবো না করেও শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের চাপে পড়ে রাজি হয়েছিলাম। না গেলে হয়তো মেঘাও খারাপ ভাবতে পারতো। আর শেষপর্যন্ত নিজেকে এটা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম যে মেঘার প্রতি আমার আকর্ষণটা ছিল একতরফা। ওর সাথে তো আমার প্রেম হয়ে সেটা ভেঙে যায়নি যার জন্য আমাকে মুখ লুকিয়ে বেড়াতে হবে ওর থেকে! তাই সাত-পাঁচ ভেবে বন্ধুদের সাথে ওর বিয়েতে হাজির হয়েছিলাম আমি।মনোজের সাথে যদিও আমাদের ভালো মতো আলাপ জমে উঠেছিল কিন্তু মেঘার সামনে থাকিনি আমি সেভাবে, কোনো কথাও বলিনি তেমন। বিয়ের সাজে ওকে দেখে আমার বুকটা একটু কেঁপেছিল কি? মনে পড়ছে না!

প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য আমি বললাম, "সে সব কথা বাদ দে! তারপর বল্ তোদের NGO-তে কাজ কেমন চলছে... ?"

এরকমই টুকরো টুকরো বেশ কথা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে। হঠাৎ দরজা থেকে ভেসে এল কন্ডাক্টরের ভারী গলায় চিৎকার, "হাওড়া স্টেশন এগিয়ে আসবেন!" আমি বাসের অন্যদিকের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম বাসটা হাওড়া ব্রিজ ক্রস করছে।

মনোজ উঠে দাঁড়ালো এবার। ওর দেখাদেখি মেঘাও সাইড ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সিট ছেড়ে বেরিয়ে এল। শুনেছি, ওদের ফ্ল্যাট আছে সালকিয়াতে। হাওড়া স্টেশনে নেমে তাই চেঞ্জ করতে হবে। দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে এমন সময় মনোজ আবার বলল, "আরে দেখলি! কথা বলতে বলতে তোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটা নিতেই ভুলে গেছি। আবার কবে যে দেখা হবে সে তো কেবল ভগাই জানেন। তার থেকে ভালো তুই বরং নম্বরটা দে। দিনের শেষে অন্তত একটু হলেও যোগাযোগটা রাখা যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ার এটুকু অ্যাডভান্টেজ নিতেই হয়, কি বলিস?", মনোজ ওর সহজাত ভঙ্গিতে হেসে উঠল। আমিও ঘাড় নেড়ে ওকে নম্বরটা দিলাম। ফোন বের করে নম্বরটা সেভ করে নিল ও।

বাসটা এতক্ষণে হাওড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। যে-কজন গুটিকয়েক প্যাসেঞ্জার ছিল তারা নামতে শুরু করেছে। মনোজ "আসি রে দেবু, আবার কথা হবে। সাবধানে থাকিস!"বলে এগিয়ে গেল। মেঘাও ওর পিছনে যেতে যেতে বলল, "এলাম রে! আবার কোনোদিনও দেখা হলে যেন তোর বিয়ের ইনভাইটেশন সমেত ফেরত যাই। আর ততদিনে আবার রকেট হয়ে আকাশে উড়তে থাকিস না যেন!" আমি ওর কথায় হাসতে হাসতে হাত নেড়ে ওদের দু-জনকেই বিদায় জানালাম। মনোজ ছাতা হাতে নেমে গেল

আগে। তার পিছনে মেঘা। নামার সময় কি ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হালকা হেসে দিয়ে গেল? কেন জানি না হঠাৎ মনে হল এটা! আমার মুগ্ধ চোখের মোহভঙ্গের ফলেই হয়তো!

ওরা নেমে যাওয়ার পর বাসটা আবার চলতে শুরু করেছে। আমি সিটের পাশের জানলাটা খুলে দিলাম। বৃষ্টি কমে এসেছে খানিকটা। একটা ঠান্ডা, ভেজা হাওয়ার ঝাপটা লাগল আমার চোখে-মুখে। আকাশে একটু একটু করে বিকেলের রং লাগছে। কে যেন একটা স্বচ্ছ সেলোফেন পেপার দিয়ে আকাশটাকে মুড়ে দিয়েছে আজ। পাশ দিয়ে যাওয়া গাড়ির হেডলাইটগুলোর আলো পিছলে যাচ্ছে ভিজে রাস্তার উপরে। ফুটপাথের উপর দিয়ে ছাতা মাথায় এগিয়ে চলেছে মানুষের পাতলা ভিড়টা।

"দাদা, এই রুমালটা মনে হয় আপনার ওই দু-জন পরিচিত কারুর মধ্যে কেউ ফেলে গেছে। এটা তুলে নিন আপনি। পরে দেখা হলে আপনি বরং ফেরত দিয়ে দেবেন", পিছন থেকে গলাটা শুনে ঘুরে দেখি আমার ঠিক পিছনের সিটে বসে থাকা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমায় ডেকে বলছেন। আমি প্রথমটায় তার কথার মানে বুঝতে পারছিলাম না, হাঁ করে তাকিয়েছিলাম তার দিকে। তারপর তার হাতের ঈশারা অনুসরণ করে দেখতে পেলাম একটু আগেই মেঘা আমাদের পাশের রো-তে যে সিটটাতে বসেছিল, তার উপরে পড়ে আছে একটা সাদা রুমাল। তার মানে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমাকে মনোজ আর মেঘার সাথে কথা বলতে দেখেছিলেন। তাই বেওয়ারিশ রুমালটা দেখে ধরেই নিয়েছেন ওটা মেঘার কাছে ছিল।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে রুমালটা টেনে নিলাম হাত বাড়িয়ে। মেঘারই হয়তো হবে, আনমনা হয়ে তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে ফেলে গেছে। আমি হেসে ফেলে রুমালটা পকেটে ঢোকাতে যাব, এমন সময় কিসে একটা চোখ পড়তে আমি আটকে গেলাম যেন। মুখের হাসিটা নিমেষে মিলিয়ে গেল। ভালো করে রুমালটা খুলে দেখলাম সাদা রুমালটার উপরে নীল সুতোর কাজে ফুটিয়ে তোলা একটা টিনটিনের ছবি! অবিকল সেই কাজ যা আমি ঠাকুমার হাতে আগে কতো দেখেছি সবসময়। বুকের ভিতরে রক্ত ছলকে উঠল আমার, একটা অজানা শিহরণ বয়ে গেল মাথার মধ্যে দিয়ে। আমি ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সাথে বারবার পরীক্ষা করতে লাগলাম রুমালটা। না, আমার তো ভুল হচ্ছে না। একদম সেই সুতোর কাজ, সেই টিনটিনের মুখ। টিনটিনের জামার উপরে স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলা হয়েছে '২১' সংখ্যাটা। এ রুমাল ছিল আমার অনেক প্রিয়, আমার ভুল হতেই পারেনা! একুশ বছরের জন্মদিনে আমাকে নিজের হাতে বানিয়ে দেওয়া ঠাকুমার উপহার।

মুহূর্তে মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল বছর পাঁচেক আগে দেখা সেই ছবিটা। বাগানের জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে যাওয়া একটা রুমাল যার মধ্যে থেকে আমারই মতো একা হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল টিনটিন। আমি সেদিন অপমান আর প্রত্যাখানের যৌথ আঘাতে রুমালটা আর কুড়িয়েও আনিনি, বলা ভালো আনার মতো অবস্থাতেও ছিলাম না। তাহলে, সেই কাদামাখা রুমালটাই কোন্ মন্ত্রবলে এমন ধবধবে সাদা হয়ে অতীত থেকে ফিরে এল আমার হাতে? সেটা এতদিন ধরে মেঘার কাছেই বা কি করছিল? তবে বাস থেকে নেমে যাওয়ার সময় ওর মুখে রহস্যময়ী হাসিটা কি আমি সত্যিই দেখেছিলাম? এতোদিন পরে কি মেঘা আমায় কিছু বোঝাতে চাইছে নাকি আমিই এসব অহেতুক ভাবছি উদভ্রান্তের মতো?

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল আমার ভাবতে গিয়ে। বাইরে থেকে আসা ভেজা হাওয়ায় এবার বেশ কাঁপুনি লাগছে আমার। কাঁপা কাঁপা হাতে রুমালটা পকেটে রাখতে গিয়েও আমি থমকে গেলাম। কি ইচ্ছা হল, একবার নাকের কাছে রুমালটা এনে বুক ভরে দম নিলাম। গোলাপের গন্ধ তো! হ্যাঁ সত্যিই গোলাপের গন্ধ পাচ্ছি এবার। আমি নিশ্চিত এতে আমার আর কোনো নাকের ভ্রম নেই । সেই রুমালে মোড়া গোলাপগুলোর গন্ধ যেন কোন্ সুদূর অতীত থেকে ভেসে এসে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছে আমার সবটুকু চেতনা। আর গন্ধটা সাধারণ গোলাপের চেয়েও অনেক বেশি মধুর, অনেক বেশি তীব্র!

রাস্তার ধারের স্ট্রিটল্যাম্পের আলোগুলো এবার জ্বলে উঠছে একে একে। তাদের আলোর রেখা বৃষ্টিভেজা পিচরাস্তার উপর তুলির টানের মতো রং ছড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশের কোলে নেমে আসছে বর্ষার বিষণ্ণ সন্ধ্যা। সারা দিনের কাজের শেষে প্রিয়জনদের কাছে ফেরার জন্য গৃহমুখী মানুষের ঢল নেমেছে রাস্তায়। আর এইসব ভালোবাসা, বৃষ্টি এবং মনখারাপ দিয়ে ঘেরা শহরটার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা বাসের জানলায় মুখ রেখে বসে আছি আমি। আমার বুকপকেট থেকে উঁকি মারছে টিনটিনের পোর্ট্রেট সেলাই করা সাদা রুমালটা, আমার 'জুলাইয়ের মেয়ে'-র দেওয়া বিলম্বিত উপহার!

~~~ ~~~ ~~~
~~~

সুবর্ণা

~ সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

সালটা ২০১৪, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে রীতিমতো একটা যুদ্ধ শুরু হয়েছে অভিভাবক তথা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে পাশ করলেও বর্তমান সিস্টেমের নিরিখে ওই মার্কস যে লোককথিত ভালো কলেজে ভর্তির জন্য যথেষ্ট নয়, সেটা বেশ টের পেলাম। অবশেষে একটি কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম। অবশ্য কলেজটি তখনো লোকেদের চোখে নামি কলেজের তকমা পায়নি। আমার আত্মীয় এবং পাড়া প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা মিটানোর দায়ে যখন কলেজের নামটা উচ্চারণ করতাম, অধিকাংশেই মুখের ভাবখানি এমন হতো যেন আমি ভুল করে একটা ভীন গ্রহের কলেজে ভর্তি হয়ে গেছি। কিন্তু বাস্তবত বলতে গেলে আমার কাছে কলেজে কাটানো এই তিনটি বছর জীবনের অন্যতম সেরা সময় ছিল। এই কলেজে এসে আমি কিছু এমন বন্ধু পেয়েছিলাম যাদের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো আমার সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। পেয়েছিলাম কিছু এমন অধ্যাপক অধ্যাপিকার সান্নিধ্য যারা ছাত্রছাত্রীদের সাথে বন্ধুর মতো মিশতো।

দেখতে দেখতে কলেজে আমার আট মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যেই আমাদের টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। পাস এর বিষয়গুলোর জন্য কলেজের হল ঘরটিতে আমাদের পরীক্ষার ব্যাবস্থা করা হতো, যেখানে কেমিস্ট্রি ছাড়াও অন্যান্য শাখার ছাত্রছাত্রীরা থাকতো। সেই বার আমার পাশে একটা মেয়ে বসেছিল পরীক্ষার হলে। মুখের মধ্যে যার ছিল এক অপরিসীম করুণা,সুন্দরতা আর সারল্য, কিন্তু ওর বা পায়ের নীচের অংশ এবং বা হাতটা ছিলো সম্পূর্ণ অকেজো। আসলে প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে ভালো লেগে যায়। পরীক্ষা শেষ হলে কিছুক্ষন ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাই। খানিকবাদে বন্ধুদের ডাকাডাকিতে অবশ্য লক্ষ্যচ্যুত হই। মেয়েটির নাম জানবার কোনো সুযোগ আমার হয়নি সেদিন, শুধু এটুকু জানতে পেরেছিলাম মেয়েটি ফিজিক্স অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কার্যত এরপর থেকে ওর সাথে কলেজে একটু দেখা করে সামান্য আলাপচারীতার সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। দেখা বেশ কিছু বার হলেও কথা বলবার মতো সাহস করে উঠতে পারছিলাম না। আর মনে মনে ওর সাথে সামান্য কথা বলার ইচ্ছেটা

এক্সপোনেশিয়াল হারে বাড়ছিলো। কিন্তু ততদিনে কলেজ ছুটি পড়ে গেল, টেস্ট পরীক্ষার পর আরো দিন পনেরো আমাদের ক্লাস হয়েছিলো।

ফিজিক্স বিভাগে আমার এক বন্ধু পড়তো, নাম অনিন্দ্য। কাজেই বন্ধুর সহযোগীতায় মেয়েটির নাম জোগাড় করে ফেসবুকে মেয়েটিকে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিলাম। রাতের মধ্যেই মেয়েটি রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করলো। শুরু হলো আলাপ পরিচয়। খুব অল্প সময়েই বন্ধুত্ব হলো গভীর। এদিকে প্রথম বর্ষের পরীক্ষার আর মাত্র একমাস বাকি। কিন্তু তখন আমি মনে মনেই মেয়েটির সাথে একটা সংসার পেতে নিয়েছি। লাভক্ষতি, পাশফেল এসব বাস্তবিক ভাবনা থেকে কয়েকশো যোজন দূরে আমি। প্রেম নিবেদনটা ফেসবুকেই সেরে ফেললাম। কিন্তু ও জানালো এটার প্রত্তুত্যর ও কলেজে সামনাসামনি দেখা হলে আমাকে দেবে। আমার উৎকন্ঠা আরো বাড়লো। পরীক্ষার ৭ দিন আগে কলেজ থেকে এডমিট কার্ড আনতে যেতে হয়। আমার একান্ত অনুরোধে সেদিন কলেজ থেকে এডমিট কার্ড নিয়ে কলেজের লাইব্রেরীতে ও আমার সাথে দেখা করতে রাজি হয়।

লাইব্রেরীতে আমি আর ও কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম, আসলে এতদিন কথা বলাটা তো আমাদের শুধু ফেসবুকেই আর ফোনেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ধীরেধীরে দু চার কথার মধ্যে দিয়ে আসল প্রসঙ্গে এলাম। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি জানো যে আমি প্রতিবন্ধী, তারপরেও কি আমার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে করুণার পাত্র সাজাতে চাইছো? আমি বহুভাবে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে ওর ধারণাটা নিতান্তই অমূলক। পরিশেষে ও একটা কথাই বললো, ও আমাকে শুধু একজন ভালো বন্ধু হিসেবেই ভেবেছে। সামনে আমার পরীক্ষার উপর যেন ওর সিদ্ধান্তের কোনো প্রভাব না পরে, সে কারণে আমাকে জানাতে চায়নি কথাটি। আমি জোর করাতে বলতে বাধ্য হলো কথাগুলো। কথাগুলো যত শুনছিলাম, ভিতরটা হয়তো ততখানি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলো। রাগ, অভিমান আর না পাওয়ার হতাশায় হয়তো সেদিন ওকে না বুঝেই বলে ফেলি, "বলতো কি ছিলোনা আমার মধ্যে? সুদর্শন, স্মার্ট আর কি চাস? তোর প্রতিবন্ধকতাতে তো আমার কোনো আপত্তি ছিলনা। তাহলে সমস্যাটা কোথায় বলতে পারিস?" উত্তরে ও বলেছিলো, "পরীক্ষাটা দিও ভালো করে।"

সেবার পরীক্ষাটা বেঁচে যায়। আমি বোধ করি ভালোবেসে কেরিয়ারের অনেকটা ক্ষতি করেছি। কিন্তু আর নয়। কেবল ওর সাথেই না, অনিন্দ্যের সাথেও কথা বলা এবং সব যোগাযোগ ছিন্ন করেছিলাম। দ্বিতীয়বর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার পর অনিন্দ্যের সাথে না চাইতেও বার কয়েক মুখোমুখি হলেও,তার দেখা পাই নি আর কখনো। যদিও আর খবর নেওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করিনি। এরপর প্রায় দেড় বছর কেটে গেল। তৃতীয়বর্ষের মাঝামাঝি দিকে অনিন্দ্য নিজে থেকে আসে আমার কাছে। আমাকে একটা চিঠি হাতে ধরিয়ে বলে "এটা তোর কাছে রাখ, বাড়ি গিয়ে যখন একা থাকবি, পারলে তখন এটা পড়িস।" বলার সময় ওর কণ্ঠস্বর কেমন কাপছিলো। আমিও ওই পরিস্থিতিতে আংশিক বিস্ময়ে আর কিছু বলতে না পেরে চুপ থাকলাম।

~~~~~~~~~~~~~~~~

বসন্ত আসে, বসন্ত যায়, ভালোবাসা নদী আপন বেগে যেদিকে ধায়, সেদিকের খবর কেউ কি পায়। বড়ো ইচ্ছে ছিল শেষবারের মতো তোমাকে দেখার, তোমার ঠোঁটের কিনারে নিজের আশ্রয় পাওয়ার, কিন্তু কি করি বলো, আমি যে ছোটগল্পের মতোই এসেছিলাম তোমার জীবনে। পড়বার ভীষণ ইচ্ছে ছিল, আমার জেদ এর কারণেই মা বাবা বাড়ির কাছের কলেজে আমাকে ভর্তি করিয়ে দেয়। আমার শর্ত ছিল আর পাঁচজন সুস্থ ছাত্রছাত্রীর মতোই আমি কলেজ করবো। আমার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও যে আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত, সেটা যেন কেউ না জানতে পারে। ছোটথেকেই প্রতিবন্ধকতার জন্য সবাই আমাকে সহানুভূতি আর করুণার চোখে দেখতো। তাই জীবনের শেষে একবার অন্তিম লড়াইটা লড়তে চেয়েছিলাম। তুমিই প্রথম যে আমার চোখে করুণা খুঁজেছিলে। আমি নিরুপায়।
শরীরের যত্ন নিও আর জীবনে দাঁড়িও। চলি।

~ইতি
তোমার সুবর্ণা

~~~~~~~~~~~~~~~~

দীর্ঘ দেড় বছর মারণ যন্ত্রণা সহ্য করে গত সপ্তাহে সুবর্ণা চলে গেছে। যাওয়ার আগে অনিন্দ্যের হাত দিয়ে জীবনের সেরা উপহারটা দিয়ে গেছে। মনের অজান্তেই চোখের কোনা বেয়ে কখন যে অশ্রুধারা বেয়ে আসলো, বুঝতেও পারিনি। জানলা দিয়ে নীরব হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সূর্যাস্তের ন্যায় জীবন থেকে একটা অধ্যায়ের নীরব সমাপ্তি ঘটলো।

অঙ্কন – ঐন্দ্রিলা সিনহা

অঙ্কন – ঐন্দ্রিলা সিনহা

অঙ্কন – ঐকান্তিকা সিনহা

অঙ্কন – ঐকান্তিকা সিনহা

অঙ্কন – অঙ্কিতা রায়

অঙ্কন – স্নেহাশ্রী হাজরা

অঙ্কন – সুমনা মন্ডল

অঙ্কন – দেবপ্রিয় ঘোষ

অঙ্কন – সুনীতি দোলুই

অঙ্কন – সুনীতি দোলুই

অঙ্কন – পূজা দাস

অঙ্কন – মমতা চক্রবর্তী

অঙ্কন – অঙ্কিতা কর্মকার

অঙ্কন – পোলমি মান্না

উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা
প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা

... উপন্যাস ...

রণথম্ভোর

~ প্রদীপ্ত সান্যাল

... প্রথম সংখ্যার পর ক্রমশ ...

দ্বিতীয় পর্ব

গঙ্গাধর তক রাজপরিবারের অন্তর্গত নয়; তার পিতা বজ্রধর তক রাজপুতানার প্রধান সেনাপতি; মহারাজ জয়ত্র সিং-এর দক্ষিণহস্ত বলতে তাকেই চেনে রাজস্থান থেকে দিল্লি! আজ দুর্গের পরিবেশের বাইরে রাজপুত্রদের এই যে তাঁবু ফেলে থাকার ব্যবস্থা,তাতে এদের সুরক্ষার ভার গঙ্গাধরের ওপরেই। মহারাজ জয়ত্র সিং তার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে হামিরদেব-কেই যে বেছে নেবেন,এ কথা রাজপুতানার যত লোক জানে,তাদের মধ্যে গঙ্গাধর একজন। সে বিস্তারিত জানে রণস্থম্ভোরপুরার ইতিহাস; যে ইতিহাস একাধারে রক্তরঞ্জিত এবং রাজপুতানার গৌরবাঙ্কিত,আর তার ভবিষ্যৎ-ও যে তার পরম বন্ধু হামির-ই,তাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সে।

“গঙ্গাধর দাদা নাকি?” অন্ধকারে প্রশ্ন করে হামির, “ঘুম আসছেনা বুঝি?”

গঙ্গাধর বুঝল, প্রশ্নটা তাকে করা হল বটে,তবে ঠিক যেন মন থেকে করা হলনা বলেই ধারণা। হয়ত বন্ধু কিছুটা অন্যমনস্ক; রাজকুমারের মনে প্রেমের উদয় হয়েছে বলে কথা! খানিকটা ঠান্ডা স্বরেই উত্তর এল, “আসবে কি করে,বলো! রাজকুমার-ই যদি জেগে চেয়ে থাকে নিজের দুর্গের দিকে,আমাদের মত ছাপোষাদের ঘুমিয়ে থাকা মানায় না হে বন্ধু,মানায় না”।

গঙ্গাধরের এই কৌতুকে শুকনো হাসল হামির, “তা ভালো”।

কিন্তু তা যে মোটেই ভালো নয়,এমনকি রাজকুমারের মনে যে কোথাও ভালো আর মন্দের একটা টানাপোড়েন চলছে,তা তো তার মুখেচোখের অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ। খুব মনোযোগ সহকারে,অথচ বিষন্ন মনে কিছু ভাবছে সখা,এমনটাই মন বলছে। কিন্তু,এত কি ভাবছে সে?

“বড় বিপদের দিন আসছে,বন্ধু”!

চমকে মুখ তুলে তার দিকে তাকায় গঙ্গাধর তক। মুখোমুখি বসে থাকা রাজকুমারের চোখ এখন তার নাগাল ছাড়িয়ে দূরের ঝাইন পাহাড়ের মাথার ওপরে সদ্য জেগে ওঠা সূর্যের দিকে। সত্যিই,এসময় ঝাইন পাহাড়কে বড় মায়াবী লাগে! তবে,পাহাড়ের খাঁজ থেকে মুখ বাড়ানো রুদ্রের চেয়েও রণথম্ভোরের ছোট রাজকুমারের মুখাবয়বের তেজ যেন আরও খানিকটা বেশী মনে হচ্ছে;

অবশ্য,গঙ্গাধর এর প্রত্যশা এটাই! যাক,সুদূর ভবিষ্যতে নিষ্পাপ রণথম্ভোরকে আবার কেউ আক্রমণ করতে এলে তার কাঁটা হয়েই হামিরদেব রক্ষা করবে রাজপুতানার গর্ব এই গোলাপকে!!!

'বিপদ?'প্রশ্ন করে গঙ্গাধর, 'তুমি কি মুসলিম হানাদারদের কথা বলছ?'

'আর কে আছে বলো ,ওরা ছাড়া?' সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায় হামির, 'সেই বাল্যবয়স থেকে শুনে আসছি সবার মুখে,দিল্লি থেকে একের পর এক আক্রমণ আর দুর্গ দখলের চেষ্টা!'

মুহূর্তে চোয়াল শক্ত হয়ে আসে বছর পনেরোর কিশোর-যুবা হামিরদেবের, 'তোমায় আমি আজ এই জ্যোৎস্না রাতের আলোয় জানিয়ে রাখছি গঙ্গাধর,রাজা হই বা না হই,রাজপুতানাকে মুসলিম আক্রমণ থেকে ছাড় দেবই,প্রাণ দিতেও রাজি তার জন্য!'

কথাটা নেহাত মন্দ বলেনি কুমার। সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীন, স্ব-অভিমানী যে হিন্দু রাজ্য এখনো পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহিরাগত শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্মান বাচিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছে,তাদের মধ্যে রাজপুতানা এক বিরাট নাম; যেমন তার সাম্রাজ্যের পরিধি,তেমনই তার জাত্যাভিমানের লড়াই। তবে সেই সুদৃঢ় আসন আর কতদিন টিকবে,তা নিয়ে সবাই যারপরনাই চিন্তিত,আশঙ্কায় ভরপুর। কুমার হামিরদেব অবশ্য শুধু চিন্তাভাবনায় দিন কাটানোয় পক্ষপাতী নয়,আজ এই আলো আধারি খেলায় সে তার একান্ত বন্ধু গঙ্গাধর তক এর সঙ্গে আলোচনা করবে, পরামর্শ করবে। তার পিতা শুধুমাত্র শিকার দক্ষতা পরীক্ষার জন্যই তাদের এই নির্জনবাস এ পাঠিয়েছেন,নাকি এর পেছনে তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে,তা জানা বিশেষ দরকার।

'তা তুমি এত কাব্য রচনা করছ দেখছি যে' ঈষৎ হেসে রাজকুমারের উদ্দেশ্যে বলে গঙ্গাধর, 'কি ব্যাপার বলোতো,এত চিন্তার মধ্যেও কাব্য?! তাও কিনা রণথম্ভোরের রাজকুমার রচনা করছে,আজ বাদে কাল যে এত যুদ্ধ করে অধীশ্বর হতে চায়?! তাহলে কি তুমি শেষমেশ স্রেফ দোয়াত-কলমে নিরামিষ যুদ্ধ করতে উঠেপড়ে লাগলে?'

'ওহহহ! দেখে ফেলেছ বুঝি?' উঠে দাঁড়িয়ে আবার দুর্গের দিকে মুখ ফেরায় হামির। এতক্ষণ যে চোয়াল প্রবল আক্রোশে বজ্রের মত শক্ত হয়ে প্রত্যেকটা দাঁত'কে এঁকে অপরের মত আঁকড়ে ছিল,তা শিথিল হয়ে আসে, 'ও কিছু না,মনের খেয়াল মাত্র'। তার ঠোঁটের কোণায় লেগে থাকা হাসিটা গঙ্গাধরের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

'উহু,নাহহহ! কি ব্যাপার বলো তো হে!' বেশ জোরের সঙ্গে,অথচ সুরে একইরকম সখ্যতা মাখিয়ে বলে গঙ্গাধর, 'এ তো প্রণয়িনীকে লেখা কাব্য মনে হচ্ছে!'

হামির নিস্তব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে দুর্গের দিকে;বন্ধুর বাক্যবাণ তার কানে আসছে বটে,কিন্তু সে হাজার চিন্তাভাবনায় মশগুল। রাজকুমার যে আগামীতে রাজা হবেন,তাতে গঙ্গাধরের কোনো সন্দেহ নেই,শুধু তার ভাবনা,কোনোমতেই নিজের দেহে প্রাণ থাকতে কুমারকে যুদ্ধে প্রাণ দিতে দেবেনা সে! ওদিকে,যুদ্ধে প্রাণ গেলে ঝাইন দুর্গের রাজকুমারীর কি হবে,হামিরদেব এই ভাবনায় মত্ত; ভালোবাসার এমন সন্ধিক্ষণ আর বেড়াজালের ঘেরাটোপে দুই বন্ধু বয়সের দোষ'কেই কেবল মনেপ্রাণে আঘাত করতে থাকে!

ভোর হয়।পুব দিগন্তে সূর্যের আভা ফুটে উঠতেই রাজমহলের প্রকান্ড ছাদে এসে দাঁড়ান মহারাজ জয়ত্র সিং। এটা তার নিত্যদিনের অভ্যাস। ভোরের আলোয় সুপ্ত অবস্থা থেকে সদ্য আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতে দেখা রণথম্ভোরকে মায়াময় মনে হয় তার। যে জায়গায় মহারাজ পায়চারি করেন,সেখান থেকে দুর্গের মূল ফটক প্রায় দেখা যায়না বললেই চলে;এর কারণ মোটেই অধিক দূরত্ব নয়,বরং শত্রু মোকাবিলার খাতিরে বিশেষ শৈলীতে তৈরি দুর্গের অলগলি বেয়ে নেমে যাওয়া সিঁড়ি আর বিশালাকার থাম-এর ন্যায় খাড়া সুসজ্জিত দেওয়াল।অবশ্য,চারপাশে দৃষ্টি বিস্তৃত করলে দেখা যায়,প্রায় যোজনখানেক লম্বা প্রাচীর যেন অসীমে গিয়ে দিগন্ত ছুঁয়েছে,তার সীমানা হয়ত কেউ কোনোকালে মেপে শেষ করতে পারবেনা। আহা,যদি কোনো এক মন্ত্রবলে প্রাচীরের মত অসীম ক্ষমতার অধিকারী করে তোলা যেত রণথম্ভোরটা, সমস্ত রাজপুতানা জুড়ে কেবলমাত্র চৌহান দের-ই শাসন কায়েম হত,আর,রইল বাকি দিল্লি!

দিল্লির কথা মনে আসতেই থমথমে হয়ে আসে মহারাজের মুখমন্ডল; ভোরের অম্লান আলোয় ধীরে ধীরে চোখের সামনে জেগে ওঠা নগরীর দিকে চোখ রেখেও,তার চলার গতি স্তিমিত হয়ে আসে। বয়স্ক মহারাজ জয়ত্র সিং দাঁড়িয়ে পড়েন;এই ব্রাহ্মমুহূর্তে যুদ্ধ আর রক্তক্ষয়ের কথা ভাবতে না চাইলেও যেন বাধ্য হয়েই তা মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ভিড় জমাতে থাকে। তার চোখ চলে যায় নীচে, দুর্গের দ্বিতীয় ফটকের দ্বারে। এতক্ষনে আলো বেশ খানিকটা ফুটে উঠেছে,সেই আলোয় দুর্গের প্রধান ফটক পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। আর দেখা যাচ্ছে,হাতি পোল এর কাছে অগুন্তি প্রজার জমায়েতটা। দুর্গের প্রধান ফটক পার করে পাথরের খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে

ওপরে উঠে আসার পথে বৃহদাকার এক হাতির প্রতিরূপ যেন পাথরের গায়ে খোদাই হয়ে গেছে সকলের অজান্তে,সেই থেকেই ওই প্রবেশদ্বার এর নাম মহারাজ রেখেছেন 'হাতি পোল'। জমায়েতটা অজানা নয়,প্রতিদিনই মহারাজের দর্শন পেতে প্রজারা এমন ভিড় করেই থাকে। মহারাজ তাদের কখনো বস্ত্র,কখনো ধনদৌলত,কখনো রাজমহলে কোনো কাজে নিযুক্ত করে থাকেন।এই সময়টায় প্রজারা মহারাজের দর্শনে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে,তবে নিরহংকার মহারাজ জয়ত্র সিং তার প্রজাদের পুত্রস্নেহেই পালন করেন। হয়ত আজও প্রজাদের ভিড়ের দিকে চেয়ে অন্যান্য দিনের মত মহারাজ তার স্নেহ বিনিময় করতেন,কিন্তু আজ হাতি পোল এর দিক থেকে তার নজর যেন কিছুতেই সরতে চাইছেনা। কই,বাকি দিনগুলোও তো এই পোলটা তার চোখে পড়ে,আজকের মত অনুভূতি তো হয়না কোনোদিন! দিল্লির চিন্তায় বিমূঢ় মহারাজ এর আবেশ বিচ্ছিন্ন হয় প্রজাদের কলরবে। রণথম্ভরের প্রজারা সাধারণত শান্তিপ্রিয় এবং রাজাজ্ঞা পালনে ব্রতী; রাজপুতানার বাকি অংশ, অর্থাৎ মেবার বা মারওয়াড় প্রদেশের রাজপুত ঘরানার চেয়ে এরা অনেকাংশেই আলাদা। সমস্ত রাজপুতরাই তাদের রাজাকে দেবজ্ঞানে সম্মান করে বটে,তবে রণথম্ভোরের জাত্যাভিমানই তার অহংকার! এরা এদের দাবিদাওয়া বিভিন্ন সময়ে মহারাজের কাছে তুলে ধরে,তবে তা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আঙ্গিকে। আজ তাদের হল কী?!! মহারাজ তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন বুঝে প্রত্যেক প্রজা একবাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে, 'মহারাজের জয় হোক! মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন!' মহারাজ এর ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটে এতক্ষণে,চিন্তার জগত থেকে সরে এসে তিনি আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত হতে চাইছেন,তা বোঝা যায়। পিতা বাগভট্ট যদি চলাফেরা করার ক্ষমতায় থাকতেন,তবে তিনি এখানে এসে দেখতে পেতেন,তার পুত্র জয়ত্র সিং এর কত শুভাকাঙ্ক্ষী সারা রণথম্ভোর জুড়ে; এমনটা ভাবতে ভাবতেই মহারাজের কানে ভেসে আসে জনাকয়েক প্রজার কণ্ঠ, 'আমরা হামিরদেবকে দেখতে চাই! শক্তিদেবকে আমরা সিংহাসনে চাইনা মহারাজ,একবারটি দেখতে চাই আমরা,কুমার হামিরদেবকে!'

মহারাজের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র সুরতান দেব'ই প্রজাদের কাছে শক্তিদেব নামে পরিচিত। রাজকুমার শক্তি গানবাজনায় অসামান্য পারদর্শী হওয়ার কারণে রাজপন্ডিত তাকে সুরতান দেব নামে ভূষিত করেছেন,এবং এই নামেই মহলের সকলে তাকে চেনে। শক্তিদেব মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে

কথা,সর্বোপরি, রাজপরিবারের প্রথা অনুযায়ী জয়ত্র সিং এর পরবর্তী রাজা হিসেবে তার-ই মনোনীত হওয়ার কথা। তবে,মহারাজের মন বরাবরই ছোটকুমার হামিরদেব এর প্রতি নিবদ্ধ,এক অদৃশ্য আকর্ষণ-এ এই বিশালাকার চৌহান সাম্রাজ্যের প্রজারাও হামিরদেবকে বাল্যকাল থেকেই তাদের নেতার আসনে ভেবে আসছে। মহারাজ যে তার প্রিয় পুত্র হামির-কেই রাজ্যপাট সঁপে দেবেন একদিন,তার ইঙ্গিত তো তিনি নিজেই এযাবৎ দিয়ে আসছেন! প্রজারা তবে আজ হঠাত কুমার শক্তি-র বিরোধে জমায়েত হয়েছে কেন? তাহলে কি তিনি যা কখনো চাননি,তাই হতে চলেছে!?? ভাই-ভাইতে যুদ্ধ করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সিংহাসন লাভের প্রথা তো রাজপুতদের রক্তে নেই,তাহলে কি সুদূর ভবিষ্যতে এমনটাই রণথম্ভোরের নিয়তি?? প্রজারা ভুল বুঝলে তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়ায়,এই ভেবে মহারাজ জয়ত্র সিং তাদের দিকে হাত তুলে শান্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রজাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'তোমরা শান্ত হও। আজ হঠাত কুমার শক্তির প্রতি এত ক্ষোভ কি কারণে,তা জানতে ইচ্ছে করছে... আমি জানি,আমার কনিষ্ঠ পুত্র হামির তোমাদের মন জয় করে ইতিমধ্যে রাজা হয়ে বসেছে,আর তার জন্মগত রাজতিলকই তার ভাগ্যের রূপরেখা। সময় হলে নিশ্চয় হামিরদেবকে আমি রাজা ঘোষণা করব'।

প্রজারা সকলেই মাথা নামিয়ে চুপ করে থাকে। বাস্তবিকই, কুমার শক্তি-র মধ্যে কোনো বদগুণ বা অত্যাচারী, দাম্ভিক মনোভাব এর লক্ষণ তো নেই। উপরন্তু,একজন বীর যোদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি সে শাস্ত্র ও সঙ্গীতে অভূতপূর্ব পারদর্শীও বটে! তবে তার দৌর্বল্য প্রকাশ পায়,যখন সে প্রজার সামনে উপস্থিত হয়। যে বয়সে একজন রাজকুমার তার পারদর্শিতা দেখিয়ে অধিকারবলে পিতার সাম্রাজ্য নিজের কাঁধে নিয়ে নেয় এবং প্রজাপালনে ব্রতী হয়,সেখানে সে একেবারেই অকর্মণ্য। মহারাজ জয়ত্র সিং যদিও মনেপ্রাণে হামির ছাড়া কাউকেই তার সিংহাসন আর সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের প্রকৃত রক্ষক হিসেবে ভাবতে পারেননা,তবুও কখনো কখনো বড়োকুমার শক্তিদেবের গুণকীর্তনকারীদের পরামর্শে তারও মন আন্দোলিত হয়। হামির প্রতিটি পদক্ষেপেই যে তিন রাজকুমারের মধ্যে সর্বোত্তম , তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই,তবু ভয় হয় তার,পাছে বড়কুমারের পরিবর্তে সরাসরি ছোটকুমারকে উত্তরাধিকারী করার সিদ্ধান্তে তার প্রিয় হামির ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়ে পড়ে। মেজকুমার বিরাম দেব শুধুমাত্র বংশের রক্তেই রাজকুমার,কিন্তু

সে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত উদাসীন; রাজার মন্ত্রী হয়ে সুখে ঘরসংসার করা আর দরিদ্র মানুষের মধ্যে নিজের সাধ্যমত ধনদৌলত দান করেই তার সুখ। রাজ্য শাসনে তার আকাঙ্ক্ষা নেই,তাই প্রতিযোগিতা কেবল দুইজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা চলে। দাদা শক্তিদেবকে হামিরদেব যথেষ্ট সম্মান করে ও বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে,অথচ কুমার শক্তি যেন একটু বেশী পরিমাণেই মেজকুমার বিরামদেব এর প্রতি আসক্ত,এটাই প্রজাদের শক্তিদেব-বিমুখ করে তুলেছে। হামিরদেবকে পিতা সবচেয়ে বেশী স্নেহ করেন,তা বড়োকুমার সহ্য করতে পারেননা,এই ভেবে আতঙ্ক উপস্থিত হয় প্রজাদের মনেও! না জানি ছোটকুমারের কিছু ক্ষতি হয়ে যায়! এসব তাদের মনের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে,কিন্তু মহারাজের সামনে রাজপরিবারের এই সব আভ্যন্তরীণ হিসাবনিকাশ তুলে ধরে রাজকুমারের অপমান করাটা শোভনীয় নয় মোটেই।

ইতিমধ্যে রণথম্ভোরের আকাশ সূর্যতাপে প্রখর হয়ে উঠেছে। এসময়ে খরতাপ মহারাজের ইদানীংকালে সহ্য হয়না,বয়সের কোপে এককালের বলিষ্ঠ মহারাজ সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ার ভয়ে সাধারণত নীচে নেমে আসেন।এদিন তার ব্যতিক্রম হতে দেখা গেল। প্রজাদের নিরুত্তর দেখে মহারাজ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন,কিন্তু হাতি পোল আবার তার দৃশ্যপট আগলে দাঁড়িয়েছে।

আচমকা 'হুকুম' কণ্ঠধ্বনিতে সম্বিৎ ফেরে মহারাজের। তার প্রধান সেনাপতি বজ্রধর তক এসে উপস্থিত হয়েছে। সেনাপতির চোখেমুখে বেশ খুশির মেজাজ।

'কি ব্যাপার ,বজ্র? তুমি এখানে?' প্রজাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে সেনাপতির দিকে চোখ ফেরান জয়ত্র সিং, 'কুমারদের কোনো বিপদ হয়নি তো?'

'কি যে বলেন হুকুম! গঙ্গাধর বেটা থাকতে ওনাদের গায়ে একটা আঁচ ও লাগবেনা।' তেমনই হেসে উত্তর দেন সেনাপতি, 'আর,কুমার হামিরদেব যেখানে আছেন! চারিদিক থেকে চোখ রাখা হয়েছে হুজুর,চিন্তা করবেন না, ওনারা নিরাপদেই আছেন'।

একটু ইতস্তত করেন সেনাপতি;কথার রেশ হারিয়ে ফের তা খুঁজে পেতে সামান্য দেরী হয় তার।

'মহারাজ! প্রতি বছরের মত প্রজারা আপনাকে অভিবাদন জানাতে এসেছে মহারাজ'।

বিদ্যুৎ বেগে মহারাজের মনে পড়ে যায় আজকের দিনটার কথা! তাই তো,এই কারনেই সকাল থেকে হাতি পোলে নজর সীমাবদ্ধ তার!!! আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে রণথম্ভোরকে নতুন জীবন দিয়েছিলেন তিনি!

----- ক্রমশ -----

ছবি – সৌরভ দে

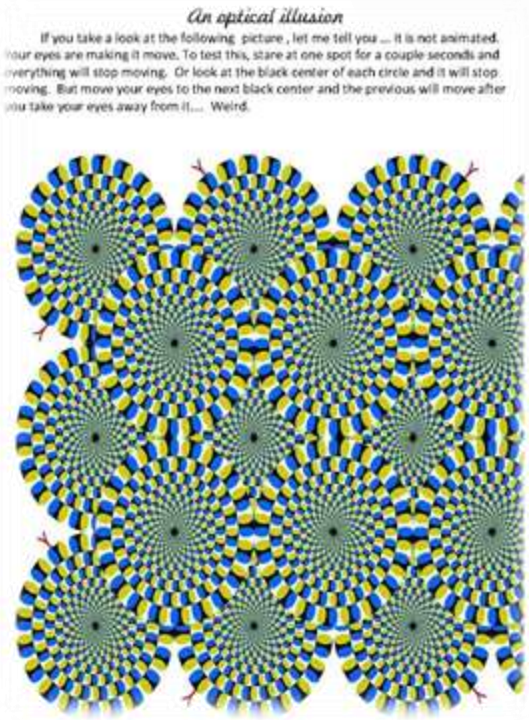

ছবি – দেবপ্রিয় ঘোষ

Childhood Emotions Same As All Person

ছবি – শুভদীপ বসাক

ছবি – রাজা দাস

ছবি – পোলামী গুপ্তা

ছবি – রাজা দাস

ছবি – শেখ মহম্মদ আকিব

ছবি – শেখ মহম্মদ আকিব

ছবি - পলাশ দাস

ছবি – পলাশ দাস

ছবি - অনিমেষ পল্লে

ছবি – অনিমেষ পল্লে

ছবি - সুমিত গাঙ্গুলি

ছবি – সুমিত গাঙ্গুলি

ছবি– দেবজ্যোতি বাগ

ছবি – শেখ মহম্মদ আকিব

ভালোবাসা

~ সৌম্যদীপ টাকী

তোকে আমি খুঁজি সারাদিন,
তুই কি তাহলে আসবিনা কোনোদিন?
মেসেজ টোনে চমকে ওঠা মন,
তোর কথা মনে করায় সারাক্ষন।।
ফুটপাতে একা হাঁটায় অসহায়তা,
কবে কাটবে কিছু স্পর্শ পাওয়ার নিশ্চয়তা ?
প্রিয় স্থানে গাছে ফোটা ফুল,
খুব মনে করায় তোর ওই সাধের স্কুল।
স্মৃতি জমানো শুকনো গোলাপের পাপড়ি,
আমায় বলে তুই কতদিন এভাবে থাকবি?
ছেঁড়া চিঠিতে সেলুটেপ লাগানোর যত্ন ,
তুই কি আর লিখবিনা চিঠি মনে করে প্রশ্ন।।
টি -শার্টে লাগানো কিছু গন্ধ,
বলে তুই আমারই আছিস, শুধু কথোপকথন বন্ধ।

কাজল পরা প্রেমিকার জন্য

~ রনিত ঘোষ

সৌদামিনী তোমার জন্য কবিয়াল হবো কর্পোরেট ছেড়ে-
একদিন বাড়ি এসে ল্যাপটপটা চিরতরে গুটিয়ে রেখে,
টাইটা খুলে দরজার পেছনে হুকে টাঙিয়ে দেব।
বিশ্বাস করো ,আর পরবো না সফিস্টিকেটেড গলার বকলেসটা,
দমবন্ধ হয়ে আসে ওই চেনটা গলায় পরলে আজকাল
তুমি বরং আলতো পায়ে ভোরের ফুল কুড়িও তুলসিমঞ্চে দেবে বলে
তোমার সদ্যস্নান করা ভিজে চুলের ঝাপটায় উঠিয়ে দিও তারপর আমাকে,
তোমার চোখের কাজলে আমাদের শহুরে যৌবন উঠুক বেড়ে-
সৌদামিনী তোমার জন্য কবিয়াল হবো কর্পোরেট ছেড়ে।

প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরে আবদার করবো মাথা মুছিয়ে দেবার-
আমার কাঁধে তোমার গভীর নিঃশ্বাস পড়বে,
চির চেনা ভঙ্গীতে তুমি আবার জড়িয়ে ধরবে
আমার পিঠের শাখাপ্রশাখায় তোমার কাজল ছড়িয়ে যাবে,
অগত্যা উঠে আঁচল ঠিক করে লাজুক মুখে উনুনে আঁচ দিও;
ভার্চুয়াল মদনজ্বালার প্রফেশনালিজমের যুগে
বাসন্তীফুলের প্রেমিককুল উঠুক সেরে,
সৌদামিনী তোমার জন্য কবিয়াল হবো কর্পোরেট ছেড়ে।

তোমার জন্য ছাতিমতলায় বসে মাঝদুপুরে সারা গায়ে-
গাঁজার গন্ধ মেখে নৈবেদ্যর চাল বাছবো,
তোমার বেহেস্তের কাজলকালো চোখ দুটোর পুজো দিয়ে
দুটো ভাতে ভাত প্রসাদ পাব বলে।
সন্ধ্যাবেলায় উচ্ছিষ্ট কাঠ জ্বালিয়ে দেব তোমার পড়ার ঘরে
ছবি এঁকো তুমি

আমাকে এঁকো, আমাদেরকেও এঁকো;
খিদে এঁকো,ক্ষুধার্ত এঁকো;
অপ্রেমে ভুগতে থাকা মৃতপ্রায় মানুষগুলোকেও বাদ দিও না।
সন্ধ্যাবেলায় উচ্ছিষ্ট কাঠ জ্বালিয়ে দেব তোমার পড়ার ঘরে-
সৌদামিনী তোমার জন্য কবিয়াল হবো কর্পোরেট ছেড়ে।

সৌদামিনী তোমাকে নিয়ে ছবি বানাবো,
সে আমার একার দেখার ছবি, খোয়াই ধারে পা ঝুলিয়ে
সরা ভর্তি হাঁড়িয়া নিয়ে লাল মাটিতে প্রজেকশন করে দেখবো তোমার ছবি।
আমাদের স্বপ্নের জগতে আজ মাল্টিস্টোরিড উঠেছে মিনি-
তাতে জামাকাপড়, খাবার দাবার,খেলনাবাড়ি আছে-
সঙ্গে ছবিঘরও বানিয়েছে মস্ত
সৌদামিনী তোমার অ্যান্টনি আজ রিহ্যাবে পচছে,
অ্যালঝাইমারগ্রস্ত।
সঙ্গী তার তোমার ছবি, রুকস্যাক ভরা স্মৃতি,
ছবি থেকে বেরিয়ে এসে একবারের জন্য
অন্তরাত্মাকে ঝাঁকিয়ে যেও জোরে
সৌদামিনী তোমার জন্য কবিগান বাঁধবো ওরাকল,জাভা ছেড়ে।

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

কুহেলিকা পরোয়ানা ... ইতি মায়ানগর

~ সুমন চৌধুরী

বহুদিন গল্প শোনাইনি বিস্মৃতিগুলোকে
কবর চাপা যেন এক একটা হাজার বছরের ক্লান্তি!
ফোঁটায় ফোঁটায় জমেছে এক যুগ সময়ের ঋণ।
তিলে তিলে শেষ হয়ে যাওয়া নিখোঁজ বাউলের
একতারার সুর, অথবা মুঠোয় ধরা হাতের মতো
হারিয়ে যাক এই অন্ধকার সকাল।

চোখে যখন কাঁচের গুঁড়ো নিয়ে
মানুষ চিনে অচেনা হৃদয়ে বন্ধুত্ব গাঁথতে ব্যস্ত,
লিখে ছিঁড়ে ফেলা চিঠিগুলোর প্রতিটা দাঁড়ি, কমা, জিজ্ঞাসায়
তখন একটাই সুরের খোঁজ।

তুমি জানো আমার কাঁচের ঘরে
কিভাবে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে ঝড়লেই
জানালার কাঁচে জলছবি আঁকে ছদ্মনাম।
সূর্যের আলোয়, বৃষ্টির আঁচড়ে
কুহেলী মিলিয়ে যায় আনুগত্য ছেড়ে।
চাইলেই কাঁচের ওপারের বৃষ্টি
অথবা ঘাসের মাথার শিশির হয়ে
হয়তো আরও একটা আঘাত দিতে!
যদিও এ ভালোর তো বাসা নেই!তাই সেই আশাও নেই।

সৃষ্টিহীন জমায়েত কে ফেলে রেখে, এক নতুন সকালে
যখন দ্যাখা হলো তোমার আমার,
যেন অল্প দূরত্বে আবছায়া কুহেলিকা।
স্পষ্ট অবয়বে শরীর ছুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে
অভিশপ্ত ইচ্ছেরা আর নিষিদ্ধ সময়।
এই সময় কিন্তু বিপরীতে প্রবহমান!
বিশ্বাস, নিঃশ্বাস কিছু দিয়েই বাঁধা যাবেনা এই সময়।
বড় অগোছালো হচ্ছে মুহূর্তগুলো !

তখন আমি সদ্য ঘুম ভাঙা একজোড়া চোখে
ভাবি, এ কি নতুন ভোরের আকাশ
নাকি সূর্যাস্তের ষড়যন্ত্র ?
অতি সন্তর্পণে ভাসমান মেঘমালা
ঢেকে ফেলেছে মাঠ, ঘাট, বাসের জানালার কাঁচ
আর আমার কফির কাপে, কবিতার ভাঁজে খামখেয়ালী শব্দের আনাগোনা
খুব পরিচিত, যেন জাতিস্মরের স্নেহ!

এবারও যে আমার রাখাল সাজা হলোনা!

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

‘YOU ARE NOT MY TYPE’

~ নীলাঞ্জন

আমাদের জীবনে কমবেশি আমরা সবাই একবার হলেও এই কথা শুনে থাকি বা বলে থাকি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের পছন্দের মানুষের কাছ থেকেই এটা আমরা শুনি অথবা যারা আমাদের পছন্দ করে কিন্তু, তাদের আমরা পছন্দ না করলে এটা বলে থাকি।

আচ্ছা, ভেবে বলুন তো কিসের TYPE??

কেউ কি কারও টাইপের হয়?

না, এই পৃথিবীতে কেউ কারো টাইপের হয় না, ঈশ্বর সবাইকে সৃষ্টি করেছে সম্পূর্ণ আলাদা রূপে।

আমাদের হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান!... নয় তো?

তেমনই এই বিশ্বের প্রত্যেকটা মানুষ একে অপরের থেকে ভিন্ন।

কোনোদিন কোনো দুটো মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে একই রকম হতে পারে না। অদ্ভুতভাবে অনেকসময় দুটো মানুষকে একই রকমের দেখতে হলেও তাদের কিছু গুণ, কিছু অভ্যেস তাদেরকে একে অপরের থেকে পৃথক চিন্তিত করে।

তাই, আমার মতে এই কথাটা অনর্থক ও অবান্তর।

আর কোথাও একটা শুনেছিলাম মানুষ নাকি তার বিপরীত চরিত্রের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি। জানি না সেটা কতটা ভুল বা কতটা ঠিক।

তবে এটুকু জানি যে, এই মহাবিশ্বে কেউ কারও 'Perfect Match' হয় না। একটা সম্পর্ক তখনই সার্থকতা পায়, যখন সম্পর্কে থাকা দুটি মানুষ একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। একটা সম্পর্কে থাকাকালীন তোমার বিপরীত দিকের মানুষটার কিছু ভুল, ত্রুটি থাকবে....এটাই স্বাভাবিক।যেটা তোমাকে তোমার ভালোবাসা, ধৈর্য্য আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মানিয়ে নিতে হবে। ঠিক একই ভাবে তোমার সঙ্গী/সঙ্গিনী-রও এই একই কাজ করা উচিত তোমার ভুল, ত্রুটির ক্ষেত্রে।

এভাবে হয়তো Perfect Couple হতে পারবে না, কারণ ওই যে বললাম- কেউ কারও 'Perfect Match' হয় না।

তবে এভাবে একটা সম্পর্ক দৃঢ় হয়, সাবলীল হয়, স্থায়ী হয়।

তাই কাউকে পছন্দ নাহলে 'YOU ARE NOT MY TYPE' এই অজুহাতটা না দিয়ে তাকে directly 'পছন্দ না' বলতে শেখো অথবা তাকে নিজের টাইপের সাথে মানিয়ে নিতে শেখো, দেখবে জীবনটা অনেক সরল হয়ে গেছে।

~~~ ~~~ ~~~
~~~

গোপন তত্ত্ব

~ মেঘা পাত্র

জীবনটা যখন পরাধীন
মরণ হবে না কোনোদিন।
মৃত্যুর স্বাদ জীবন লালসা মাত্র,
বন্ধ স্বপ্ন, বন্দী হস্ত রইবে মৌন যত্র।
সবকিছু ঠিক, হবে না অতীত
সইবে বক্ষ তত্র।
প্রশ্ন অধিক মৃত্যুর দিক
বন্ধ কর দ্বার।
চাইনা হস্ত, চাইনা হৃদয়, চাইনা মিথ্যাচার।
লাভবান তুমি, তোমার ধ্বনি
বাজছে দিকবিদিক।
হৃষিকের জয় ক্ষমা করো হায়
কর্ম তোমার সমিপ।।

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

বৈপরীত্য

~ ইশিতা পাল

ঝাপসা কাঁচের ভিতর থেকে দুনিয়া চেনা যায় না।
বুড়ো খোকারাও এসে কাছে,
তোমার ধরে বায়না।
মুখগুলো সব তৈরি তাদের দেবতাদের ছাঁচে,
কাছে গিয়ে দেখলে পরে দেখবে রাবণেরও আছে।
ছোট্ট ছোট্ট মুখ গুলো সব মায়ায় যেন মোড়া
ধোকা খেয়ো না,
মুখ গুলো সব হাসির অভিনয়েতে ভরা।
তখন ভুলেছি বললেও সহজে যে সব কিছু ভোলা যায় না,
মুখটি তোমার দেখায় তখন ভাঙা কাঁচের ওই আয়না।
সহ্য করার ক্ষমতা থাকলেও,
সহ্য যে সব হয় না।
সহস্র রাত কাটলে পরেও দিবা দেখে নারে নয়না।
সাঁতার জানলে পরেও এ মন ডুব দিয়েছে পাছে,
মাঝে মাঝে ক্লান্ত দেহ গুলো ঝুলছে সবুজ গাছে।

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

নগ্নামি

~ শর্মিষ্ঠা জানা

কামের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত শরীরে 'আরো চাই', এর বাসা।
তাও যৌন খিদে মেটাতে অক্ষম শরীরি ভালোবাসা।
আদিম রিপুর করাল গ্রাসে আধুনিকতায়, "ওয়াইল্ড লাভ"।
এটাই নাকি কালচার, আপডেটেড না হতে পারলে সমাজে খাবেনা খাপ।

টাকার জোরে সব-ই ঢাকে, ঢাকছে সমাজ নগ্নতাকে।
যতই ঢাকুক ওপর ওপর, মাছ ঢাকেনা কখনোই শাকে।
পোস্ট হচ্ছে পাশবিক ভিডিও, বাঁচানোর লোকের অভাব।
ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে রেকর্ড করা নগ্ন মনের স্বভাব।

রাতের অন্ধকার বা দিনের আলোয় করছে যারা ধর্ষণ।
নগ্ন তাদের চরিত্র, নগ্ন তাদের মন।
বাহাত্তরের বৃদ্ধারও নেই রেহাই, মানবিকতা কোথায় আজ!
নামে শোষণ নীতি, চোখের সামনেই লুঠতরাজ।

অ্যালকোহলে আসক্ত যুবসমাজের মৃত্যুবীজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
নেশার ঘোরে তাল মেলাচ্ছে নগ্নতার-ই ছন্দে।

অভিযোগ দায়ের করতে গেলেও হেনস্থার নেই শেষ,
সব থানা-ই বলে 'আমার এলাকায় নয়' এইতো আমাদের দেশ।

নগ্ন শরীর, নগ্ন মন, নগ্ন এ সমাজ।
"সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে; শাবাশ, শাবাশ"

মোমবাতি মিছিলে হবেনা পরিবর্তন নোংরা মানসিকতার।
গ্রহণ লেগেছে মানবিকতায়, ভুগছে সমাজ হীনমন্যতায়।
আসবে কবে সেই দিন?
সেই নিষ্পাপ কণ্ঠের জনসমক্ষে চিৎকার, "রাজা, তোর কাপড় কোথায়?"

~~~ ~~~ ~~~
~~~

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

সংসারী

~ সন্দীপ চন্দ্র

ছেলেটা এখন সংসারী,

বাইরে থেকে এসে টেবিলের উপর ঘড়িটা খুলে রাখে, ঘামে ভিজে যাওয়া টিশার্ট বারান্দার তারে।

সে এখন সংসারী,

বাইরে থেকে এসে পা ধুয়ে,

খাটের নিচে যে নকশা করা পাপোশ টা রেখেছিস ওটায় পা মুছে খাটে ওঠে।

হুম, সেই অগোছালো এলোমেলো ছেলেটা আজ

সংসারী,

সকালবেলা বাজারের থলেটা নিয়ে বাজার যাওয়া,

রবিবারে তোর পাশে দাড়িয়ে কড়াই খুন্তি তে হাত,

আর ঘামে ভিজে যাওয়া মুখটা তোর শাড়ির আঁচলে।

হ্যাঁ,

ছেলেটা আজ সংসারী,

যখন তুই প্রচুর জ্বরে কাঁপিস,

বুকের মাঝে তোর মুখটা চেপে ধরে শরীরের সমস্ত উষ্ণতা তোর জন্য

রাখে।

সেই ছেলেটা আজ সংসারী।

শীতের ভোর রাতে ছাদে কুয়াশা দেখতে নিয়ে যাওয়ার সময়, সেই ছেলেটা চাদরের ভিতর তোর মুখটা আগলে রাখে।

হ্যাঁ ছেলেটা আজ সংসারী।

বৃষ্টির দিনে জানালাটার ধরে, বৃষ্টি ভেজা মুখটা অবাক ভাবে দেখে আর বৃষ্টি স্নাত চোখটা ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করে সেই ছেলেটা আজ সংসারী।

অফিস থেকে ফিরে আসার সময় যার হাতে বেলফুলের মালা তোর জন্য,

সে আজ সংসারী।

একটা ক্লান্ত দুপুরে যার কোলে তোর মাথা থাকে,

তার হাতে থাকে শরদিন্দু'র ঐতিহাসিক,

আর সে গল্প পড়ার ফাঁকে তোর দিকে তাকিয়ে বলে -"তুমি সন্ধ্যার মেঘ "।

হ্যাঁ সেই ছেলেটা সংসারী ।

অঙ্কন – শুভদেবলীনা বোস

অঙ্কন – শুক্তি চক্রবর্তী

অঙ্কন – মনিশা সামন্ত

অঙ্কন – রাজা দাস

অঙ্কন – সুরঞ্জিতা মল্লিক

অঙ্কন – সৌমি বোষ

অঙ্কন – সায়ক সিনহা

অঙ্কন – প্রিয়াঙ্কা টাকি

অঙ্কন – সায়নী দাস

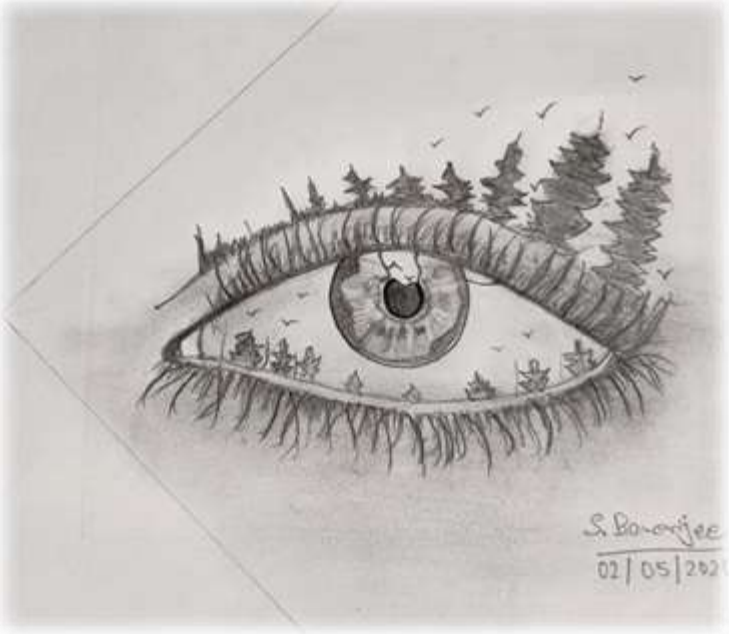

অঙ্কন – স্বর্ণেন্দু ব্যানার্জী

অঙ্কন – রঙ্গন

অঙ্কন – রঙ্গন

অঙ্কন - রিয়া সরকার

অঙ্কন – রিয়া সরকার

অঙ্কন - পোলমি ভট্টাচার্য

অঙ্কন – পোলমি ভট্টাচার্য

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

নিয়তি

~ সৌরনীল সিনহা

নিয়তির নামের সাথে তার জীবনের খুব মিল। তার পরিবার বলতে কেউ নেই,তার জন্মের পর তার বাবা-মা দুজনেই মারা যায়। ছোটবেলা থেকে মামার বাড়িতে মানুষ সে , না ! মামা-মামি, মাসি কেউ নেই, আছে শুধু দিদা। দিদাকেই সে মা-বাবা সবটা মানতো। একদিন সে দিদাও চলে গেল তাকে ছেড়ে অনেক দূরে,যেখানে তার মা-বাবা আছে। আসলে সে বরাবর নিজের নামকেই দোষারোপ করে এসেছে। একসময় গিয়ে সে বুঝতে পেরেছে, আজ যারা তারই মতো আছে, পরিবা্রহীন তাদের কি অবস্থা ? সেতো এখন পড়াশোনা করে, স্বাবলম্বী। অনেকেই আবার তাদের বাড়ি থেকেও অনাথ, তাদের কথা? তারাও তো কোথাও একটা তার নামটা বহন করে চলেছে বছরের পর বছর।

তাই আজ সে একটা এনজিও চালায়, একা নয় তার সাথে আছে তার কিছু বন্ধু। এনজিওর নামটাও দেয় 'নিয়তি নিবাস'। অনেকেই ভাববেন তার নামের সাথে এনজিওর নাম রেখেছে সে, কিন্তু একটু ভাবলে দেখা যায় হয়তো নামটা এখানে আসা সব মানুষের কথা ভেবে। আসলে নিয়তি মানুষকে কোথায় এনে দাঁড় করায় তা কেউ বলতে পারে না, তারাও তার মতো নিয়তির দোষে আজ অনাথ। কারোর পরিবারের কেউ নেই, আবার কারোর পরিবার থেকেও নেই, কিন্তু এখন তাদের পরিবার এই নিবাস। তাকে এখানের সবাই খুব ভালোবাসে , বলতে গেলে সে তাদের কাছে ভরসার আরেক নাম। কিন্তু এ সুখও তার বেশিদিন থাকলো না, হঠাৎই তার ক্যান্সার ধরা পড়ে।

এই এতক্ষণ পর স্বাগতের চোখে একটু জল দেখা গেল। সে এতক্ষণ ক্যামেরার সামনে এতগুলো কথা বলে যাচ্ছিলো। আজ এই নিবাসে সবটুকু আছে নেই শুধু সেই মেয়েটি, যে একা হাতে সবটা গড়ে ছিল। সে এখন বহুদূরে এক ঘুমের দেশে। আজ তার এই করে যাওয়া কাজ নিয়ে একদল সাংবাদিক এসেছে ইন্টারভিউ নেবে বলে, কিন্তু আজই সে নেই, একেই বোধহয় বলে নিয়তি। তার অনেক স্বপ্ন ছিল এই

এনজিও নিয়ে, অনেক কিছু করতো, তার না করা গুলো আজ তার বন্ধুরা পূরণ করবে। এভাবেই নিয়তির কাজ গুলো রয়ে যাবে, শুধু থাকবে না নিয়তি।

~~~ ~~~ ~~~
~~~

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

দুই ঘরের গল্প

~ অঙ্কিতা ঘোষ

আজ সকালে,

ভিডিয়ো কলে অনীকের শুকনো মুখটা দেখে,

দিতি ভারী হয়ে আসা গলাটা যতটা সম্ভব হালকা করে বলল,

- "ওমন প্যাঁচার মতন করে আছিস কেন রে? কাকিমা খেতে দেয় নি বুঝি?"

অনীক শুকিয়ে আসা মুখেই বললে,

- "হাতের টাকা কটা শেষ। টিউশনও তো পড়াতে যেতে পারছি না। চাকরীর পরীক্ষাগুলো সব পিছিয়ে গেল। অসহায় লাগছে রে।"

দিতি ভরসা রেখে বললে,

- "একদিন সব ঠিক হবে।"

অনীক দাঁত চেপে বললে,

- "আমি হার মেনে নিয়েছি। তুই অন্য কাউকে বরং বিয়েটা..."

দিতি একটা ধমক দিয়ে বললে,

- "আবার বাজে কথা বলছিস। রেগে যাব কিন্তু। দেখিস, আমাদের সব স্বপ্নপূরণ হবে। তুই চাকরী করবি। আমাদের একটা ছোট্ট ঘর হবে।"

অনীক দীর্ঘশ্বাস ফেলল,

- "সত্যিই কী হবে? আমাদের ঘর, ছোট্ট বাগান?"

দিতির খুব ইচ্ছে করছিল, অনীকের ঘন চুলগুলো ঘেঁটে, ওকে জাপ্টে জড়িয়ে ধরে।

চোখের জল সামলে, মুচকী হেসে দিতি বললে,

- "ঘরের বারান্দাটা কোনদিকে থাকবে?"

অনীক হেসে বললে,

- "দক্ষিণেখোলা বারান্দা হবে। দুটো বেতের চেয়ার থাকবে আর ছোট্ট টেবিল।"

দিতি মাথা নাড়িয়ে বললে,

- "আমাদের ঘরের ছাদে একটা বেলীফুলের গাছ লাগিয়ে দিবি তো?"

অনীক বললে,

- "দেব। আমারা দুজন মিলে একটা ছোট্ট ঘর বানাবই।"

দিতি নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে বলে,

- "বানাবই। আমাদের ছোট্ট ঘরটা বানাবই।"

আজ দুপুরে,

দিতিদের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে, মালা'র হাত থেকে ভাতের দলাটা মুখে নিয়ে বছর বারো'র টুপুর বললে,

- "মা, আমরা ঘর যাব কবে?"

মালা একটু থমকে, আলতো করে হেসে বললে,

- "কেন? ভালো লাগছে না? দিতিদিমণি তোকে কত আদর করে, খেলনা দেয়।"

ভাতের দলাটা গালের মধ্যে টোপলা করে রেখে, টুপুর বলে,

- "এটা তো আমাদের ঘর না। ওদের ঘর। থাকব না এখানে।"

মালা জিভ কেটে বড়ো বড়ো চোখে বলে,

- "ছিঃ টুপুর। ওমন বলতে নেই। ঝড়ের সময় ঘরটা যখন ভেঙে গেল, তখন দিতিদিমণিরা আমাদের থাকতে না দিলে কোথায় যেতাম বল তো?!"

টুপুর পাঁচমিশালি তরকারির গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বললে,

- "মা চলো না, আমাদের ঘরে যাই। নিজেদের ঘরে। জানো, আমাদের বিছানার নীচে আমি একটা ঘুড়ি লুকিয়ে রেখেছি। বাবা এলে দুজন মিলে ওড়াব। মা, ঘরে যাব। চলো না। মা?"

ভাতের দলা হাতে রেখেই মালা বললে,

- "ঘর তো ঝড়ে ভেঙে গেল। চালাসুদ্ধ উড়ে গেল! দাঁড়ানোর জায়গাটুকু তো নেই।"

টুপুর চোখভর্তি জল নিয়ে বলল,

- "আমরা কোনদিন আর ঘর যাব না?"

মালা ভাতের আরকটি দলা মুখে পুরে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললে,

- "তোর বাপ আসুক আগে। ঘর ঠিক করার পয়সা তো নেই আমার কাছে। পেটের ভাতটুকু জোগতে পারি না, ঘর ঠিক করব কি করে?!"

টুপুর ভাতের দলা থেকে মুখ সরিয়ে বললে,

- "ঘরে যাব। নিয়ে চলো। ভাত খেতে চাইব না আর। চিঁড়েই খাব। নিয়ে চলো না মা ঘরে। কবে যাব?"

মালা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে,

- "যাব। ঘরে যাব। তোর বাবা ফিরুক। আবার ঘর হবে। তোকে একটা ঘুড়ি কিনে দেব। ঘরের উঠোনে বাপ আর মেয়েতে ঘুড়ি ওড়াবি আর আমি ঘরের দাওয়ায় বসে তোদের জন্য পায়েস বানাব। ঘর হবে আবার।"

আজ বিকেলে,

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পাঠানো ট্রেনে উঠতে না পেরে, টুপুরের বাবা হারান হাঁটতে শুরু করল হাইওয়ে ধরে।

ছিঁড়ে যাওয়া চটিতে হঠাৎ পা আটকে মাঝরাস্তায় পরে গিয়ে হারান বলে উঠল,

- "ঘরে ফিরে, একটা চটি কিনতেই হবে।"

আবার আরেকটু হেঁটে এসে,

রাস্তার পাশে একটা আধা তৈরী হওয়া বিরাট বাড়ি দেখে থমকে দাঁড়ায় হারান।

পকেটের পয়সাকড়ি কটা চেপে ধরে হারান বলতে থাকে,

- "চটি পরে কিনব। এবার ঘরে ফিরে, ঘরের পুরোনো চালাটা ফেলে টিনের চালা দেব। তাহলে আর ঝড়ে উড়ে যাবে না। বাইরে যখন খুব ঝড় হবে, ঘরের ভেতরে বসে টুপুরকে একটা ভয়ের গল্প বলব, মালাকে বলব একথালা গরম খিচুড়ি করতে। তিনজন মিলে খাব এক থালায়।"

হাতদুটো কপালে ঠেঁকিয়ে হারান আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,

- "ভগবান, পৌঁছে দাও সবাইকে ঘরে। নিজের ঘরে।"

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

গুমনামি ও আমি

~ অরিজিত পাল

রাতে বিছানায় শুয়ে গুমনামি সিনেমাটা দেখছিলাম। ছেলেবেলা থেকে নেতাজি বরাবরই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বলা ভুল হবেনা, একজন বাঙালির কাছে নেতাজি নামটা শুধু একটা নাম নয়, একটা ইমোশনও বটে। তাই ভাবলাম হয়তো এই সুভাষচন্দ্রই পারবেন আমাকে এই বর্তমান পরিস্থিতি থেকে একটু হলেও সুরাহা দিতে। আর চারদিকে যা অবস্থা তাতে একটু বাস্তব থেকে দূরে পালাতে ক্ষতি কি?

সিনেমা দেখা শুরু করলাম। সিনেমার প্রথম দিকের ঘটনাগুলো হয়তো কারোরই অজানা নয়, তাও যদি নতুন কোনো ডিটেল পাওয়া যায়, সেটা ভেবেই মোবাইলের স্ক্রিন এর ওপর চোখ রাখছিলাম। চোখ যতই নেতাজির ওপরে থাকুক, মাথাতে তো সেই "হোম কোয়ারেন্টাইন" ঘুরছে। চারিদিকে যখন কোরোনার প্রকোপ তখনও আমাকে অফিসে যেতে হচ্ছে। আসলে আমার চাকরিটাও আজ এক সামাজিক কর্তব্য হিসেবে পরিচয় পেয়েছে। প্রতিনিয়ত জীবনের বাজি রেখে এই দৈনন্দিন লড়াই চালিয়ে যেতে পারবো কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর আজও আমি খুঁজে যাচ্ছি।

হঠাৎ মনে পড়লো যে এই সুভাষচন্দ্রও তো একসময় গৃহবন্দী ছিলেন ব্রিটিশদের হাতে। তার মহানিস্ক্রমনের কথা তো কারোর অজানা নয়। 1941 সাল। পাঠানের বেশে ব্রিটিশের নাকের তলা দিয়ে তিনি কলকাতা ছাড়লেন। তারপর ভারতবর্ষ থেকে পেশোয়ার হয়ে কাবুল, তারপর জার্মানি। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

ভাবতে শুরু করলাম। যদি তিনি নিজের দেশ ছাড়তে পারেন স্বাধীনতার জন্য, তাহলে কি আমি নিজের স্বাধীনতার জন্যে এই "হোম কোয়ারেন্টাইন" ছাড়তে পারবোনা? এখন তো ব্রিটিশের পুলিশও নেই, আছে শুধু কিছু সিভিক পুলিশ।

ভাবনাটা ঘনীভূত হওয়ার আগেই চন্দ্রচুর ধরের গলাতে সেই সংযোগটা কেটে গেলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ ফেরালাম। মুখার্জী কমিশনের অধিবেশন শুরু হয়েছে। একের পর

এক প্রচলিত ঘটনাকে জল্পনার মতো উড়িয়ে দিচ্ছে চন্দ্রচুর। তাহলে কি এতদিন ধরে যা ইতিহাসে পড়ে এসেছি সে সব কিছুই মিথ্যে? আজ কি এক নতুন ইতিহাসের সন্ধান পাবো আমি? প্রশ্নের উত্তরটা পাওয়ার আগেই ডিরেক্টর চলে গেলেন ফ্লাসব্যাকে।

উফ্, সৃজিতদা এই স্বভাবটা আর ছাড়তে পারলো না। আবার ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এদিকে আমার চোখের পাতা দুটোও আস্তে আস্তে ভারী হয়ে আসছে। কিন্তু এখন ঘুমোলে চলবেনা। আমাকে তো জানতেই হবে, যে সত্যিটা কি। তাই চোখে মুখে জল দিয়ে আবার দেখা শুরু করলাম।

এদিকে পর্দাতে গুমনামি বাবার এন্ট্রি হয়েছে। বুম্বাদার মেকআপ আর অভিনয় দুটোই অনবদ্য। আর অনির্বানের কথা তো ছেড়েই দিলাম। অসম্ভব সংলাপ ডেলিভারি আর তেমনি অভিনয়। প্রতিটি সংলাপ যেন একটা বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন ছুড়ে দিচ্ছে। একদিকে এই সিনেমার প্লট আর অন্যদিকে আমার জীবনের বাস্তবতা, দুটো মিলে মিশে যেন একটা অদ্ভুত মেল্যানক্যালির সৃষ্টি করছে। মনে হচ্ছে যেন দুটি ঘটনা একে অপরের পরিপূরক যা একে অপরের মধ্যে অনায়াসে মিশে যাচ্ছে।

সুভাষচন্দ্র আর গুমনামি বাবার এই জটিল অংকের হিসেব মেলাতে মেলাতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও জানিনা। যখন ঘুম ভাঙল দেখি যে মোবাইলটা পাশে পড়ে আছে। ঘরের আলোটাও সারারাত জ্বলেছে। আর হইচই অ্যাপটাও ঠিক শেষ দেখার মুহূর্তেই আটকে গেছে। স্ক্রিনে হাত দিতেই গান বেজে উঠলো।

"সুভাষজী, সুভাষজী ওহ্ জানে হিন্দ আগেয়ে

হে নাজ্ জিসপে হিন্দ্ কো, ওহ্ সানে হিন্দ্ আগেয়ে।"

সুভাষ ঘরে ফিরেছেন কিনা আমরা কেউই জানিনা। হয়তো উনিও কোথাও আটকে গেছেন আর আমার মতো অপেক্ষাতে আছেন, কবে এই বিষাক্ত ভাইরাসের অবসান ঘটবে আর তিনি তার প্রিয়জনদের কাছে ফিরবেন।

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

Child Abuse and its Prevention – A Legal Analysis in Indian Context

by Aniruddha Karmakar

Introduction

Children are our greatest hope and asset. In our country, there are over 472 million children. They constitute 39% of the total population. They are our most vital national resource. In the modern era when the world is becoming a global village it is our obligation to commit to the causes of the child and well-being of human race. Contribution to guaranteeing a better future for children free from the scourge of malnutrition and ill health conducive to their growth and development is need of the hour. It is our duty to see that Rights of the child can survive and thrive under umbrella of an adequate legal system.

Children constitute the weakest and most vulnerable, most helpless as well as most precious segment of the human society. Thus, every state has to develop a good vulnerability management. Law relating to children is one of the strategies of this vulnerability management.

Definition of Child and Child abuse: -

First, the word 'Child', the definition is age specific. The term 'Child' has been used in differing contexts of defining a relationship reflecting incapacity, infancy and need for special protection.

Underlying the varying meanings of child, there are different conceptual image of the child, these include the view that children are undergoing temporary disabilities seeking a claim for special treatment and protective discrimination, the view that children are most vulnerable group calls for steady attention for development; the view that children as the future resource of the family and the nation; the view that the society needs the children and their nurturance for the sustenance and propagation of the family and generation.

Second, the word 'abuse' needs by understood with all its meanings. Black's law dictionary defines the word 'abuse' as everything which is contrary to a good order established by usage, departure from reasonable use, improper use, physical or mental maltreatment, deception. Oxford Advance Dictionary defines abuse to mean wrong or bad use or treatment, exploit, unjust or corrupt practice, acts which are insulting, offensive. Chambers dictionary defines as to make a bad use of, to take under advantage of, to betray, to misrepresent, to deceive, to revile, to maltreat, to violate, an evil or corrupt practice, deceit, hurt, ill-usage etc.

Then, the term 'child abuse' encompasses a broad and wide range of acts and maltreatment of children. There is also no consensus about its various forms which can include child battering extreme punishment, hard labour, emotional abuse, sexual abuse, including incest and exploitation, abandonment.

Right of the child, child care and child development problems have been attracting the attention world over. Article 18 of the U.N. Convention on the Rights of the Child, 1989 recognizes the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work which is likely to be hazardous, or to be harmful to the child's health or, physical mental, or spiritual, moral or social development or it is likely to cause interference with the child's education, 1979 was declared as the International Year of the Child.

Article 24 of Indian Constitution prohibits the employment of a child below the age of 14 years in any factory or mine or its engagement in any other hazardous employment. Article 39 clauses (e), (f) and Article 45 also make previsions for the protection of children against the exploitation and against the moral and material abandonment.

Since, Article 39 and 45 belong to the Part IV of the constitution, that is, the Directive Principles of State Policy; therefore, it becomes the constitutional obligation of state to adopt measures, in pursuance of these Articles, for the development children in healthy manner and in the condition of freedom and dignity.

Legislation on child abuse: -

The Constitution of India imposes primary responsibility on the state to ensure that all the needs of children are met and their basic human rights are fully protected. The State is required to direct its policy towards securing children opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and moral and material abandonment. All children until they complete the age of 14 years should be given compulsory and free education. The health and strength of tender age of children should be protected against abuse and it must be ensured that they are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. Clause (3) of Article 15 of Indian Constitution enables state to make special provision in favor of children.

In our Indian Penal Code, 1860, Section 366A deals with procuration of minor girls from one part of India to another for prostitution. Section 366B of Indian Penal Code makes it an offence to import into India from any country outside India girls below the age of 21 years for the purpose of prostitution.

Section 372 of Indian Penal Code says that whoever sells, lets to hire, or otherwise dispose of any person under the age of eighteen years with intent that such person shall, at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will, at any age, be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Thus Section 372 of Indian Panel Code covers all the parties who sell or let including father, mother or natural guardians, while Section 373 of Indian Penal Code deals with keepers of brothels and all others who earn profits arising from the general prostitution of girls.

Child in Need of Care: -

Section 2(14) of The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act,2015 gives a comprehensive meaning of the term 'child in need of care and protection', so that proper attention might be given to such neglected children. According to Section 2(14) of the above Act of 2015 'child in need of care and protection' means a child -

(i) who is found without any home or settled place of abode and without any ostensible means of subsistence; or

(ii) who is found working in contravention of labour laws for the time being in force or is found begging, or living on the street; or

(iii) who resides with a person (whether a guardian of the child or not) and such person— (a) has injured, exploited, abused or neglected the child or has violated any other law for the time being in force meant for the protection of child; or (b) has threatened to kill, injure, exploit or abuse the child and there is a reasonable likelihood of the threat being carried out; or (c) has killed, abused, neglected or exploited some other child or children and there is a reasonable likelihood of the child in question being killed, abused, exploited or neglected by that person; or

(iv) who is mentally ill or mentally or physically challenged or suffering from terminal or incurable disease, having no one to support or look after or having parents or guardians unfit to take care, if found so by the Board or the Committee; or

(v) who has a parent or guardian and such parent or guardian is found to be unfit or incapacitated, by the Committee or the Board, to care for and protect the safety and well-being of the child; or

(vi) who does not have parents and no one is willing to take care of, or whose parents have abandoned or surrendered him; or

(vii) who is missing or run-away child, or whose parents cannot be found after making reasonable inquiry in such manner as may be prescribed; or

(viii) who has been or is being or is likely to be abused, tortured or exploited for the purpose of sexual abuse or illegal acts; or

(ix) who is found vulnerable and is likely to be inducted into drug abuse or trafficking; or

(x) who is being or is likely to be abused for unconscionable gains; or
(xi) who is victim of or affected by any armed conflict, civil unrest or natural calamity; or
(xii) who is at imminent risk of marriage before attaining the age of marriage and whose parents, family members, guardian and any other persons are likely to be responsible for solemnization of such marriage;

International Sceneries: -

To protect child from exploitation and provide them opportunities for harmonious development, the United Nations has focused its attention on their problems since 1946. The General Assembly established the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) on 11 December, 1946. The purpose of this fund was to provide assistance to the children and adolescents of those countries which had been the victims of aggression.

Civil rights and liberties of the child: - Under the United Nations Convention on the Rights of the Child: -

A child enjoys following civil rights and liberties –

i) Every child has the inherent right to life and shall be ensured to the maximum extent possible the survival and development.
ii) Right to name and nationality – Every child shall have a right to be registered immediately after birth, the right to a name and nationality and the right to know and be cared for by his or her parents.
iii) Right to identity. Every child has right to preserve his or her identity, nationality, name and family relations.
iv) The Right to freedom of expression. Every child has right to freedom of expression which includes freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds.
v) Every child has right to freedom of thought, conscience and religion.
vi) Every child has right to freedom of association and a freedom of peaceful assembly.
vii) The Right to privacy. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence, or to

unlawful attacks on his or her honor and reputation.

viii) Children of ethnic, religious or linguistic minorities or of indigenous populations shall have right to enjoy their own culture and to practice their own religion and language.

ix) No child be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment including capital punishment or life imprisonment without possibility of release.

Conclusion- For children in need and requiring care and protection, the child welfare committee, constituted by the State Government for every district or group of districts, has been empowered to dispose of cases for the care, protection, treatment, development and rehabitation of the children as well as to provide for their basic needs and protection of human rights. A child who has no family or ostensible support may be allowed by the Child Welfare Board to remain in children's home or shelter home till suitable rehabitation is found for him or till he attains the age of eighteen years.
Although, April month treated as 'Child Abuse Prevention Month', but it is our duty for all citizen not to treat only one month special for children, but to treat the whole year, like Shibpur Sristi, who give their best effort to take care children for whole year.

BIBLIOGRAPHY

1. Law and child Editor
Dr. Nirmal Kanti Chakraborty
Associate Editors
Prof. Dr. Manabendra Kumar Nag
Dr. S.S. Chatterjee
PUBLISHER R. CAMBRAY & CO. PRIVATE LTD. 2004

2. Indian Penal Code by
Surya Narayan Misra and
Sanjay Kumar Misra
Publishers Central Law Publications

3. Human Rights by
Umesh Chandra
Publishers Allahabad Law Agency Publications.

4. Indian Penal Code by
K.D. Gour
Publishers Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd.

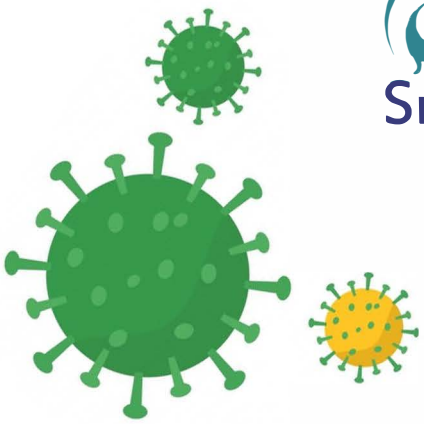

করোনার করালগ্রাস

উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা
প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা

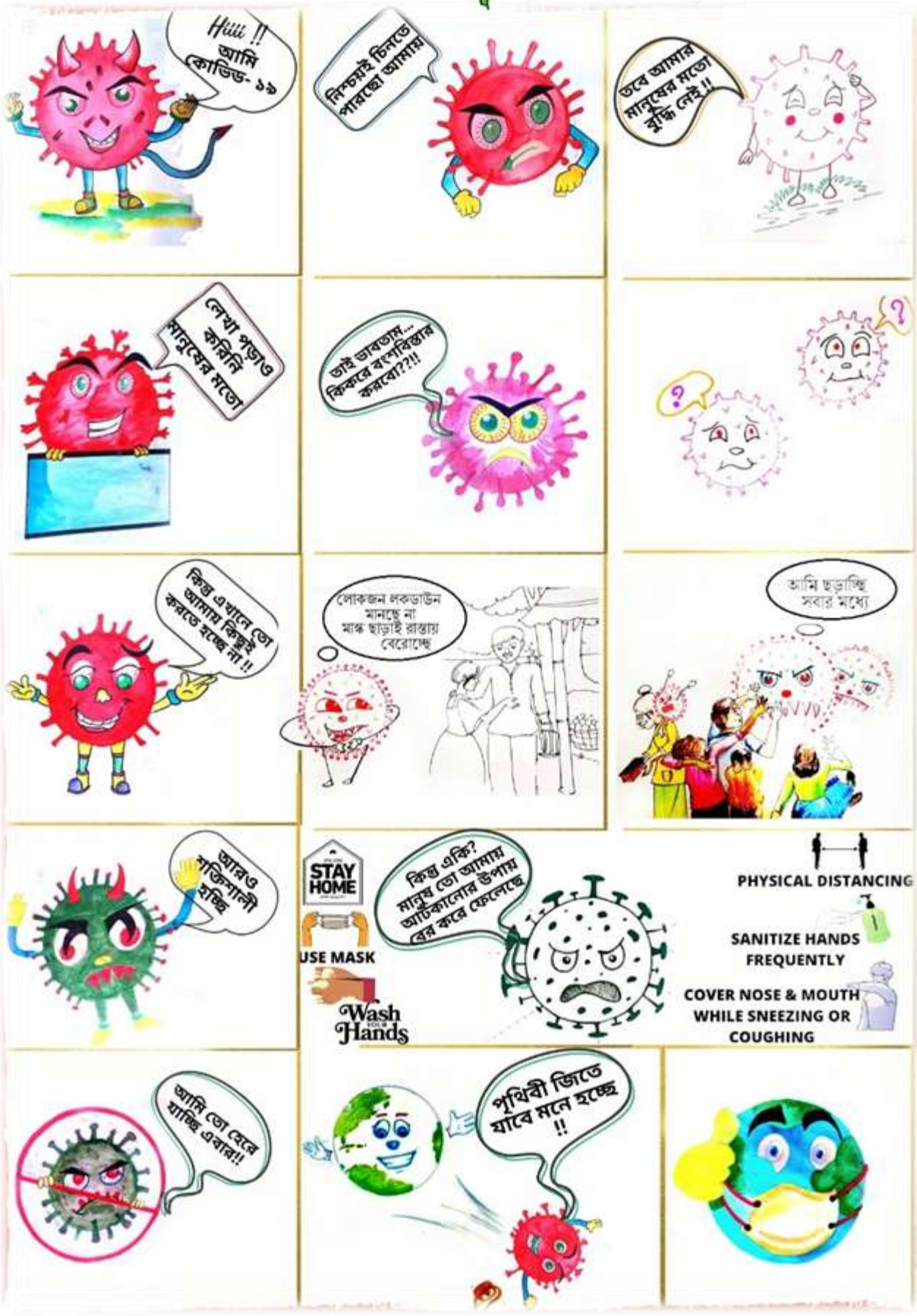

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

করোনা (Covid 19)

এই covid 19 এমন এক ধরনের ভাইরাস যেটা আক্রান্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাস মাধ্যমে ছড়ায়। এই জন্য সরকারের তরফ থেকে করোনা ভাইরাস মোকাবিলার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে সচেতনতার প্রচার। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা থেকে শুরু করে মাস্কের ব্যবহার, বার বার হাত ধোয়ার জন্য বলেছে। কিন্তু এত কিছুর পরও সকলের মধ্যে সচেতনতা আসছে না। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা গেছে নতুন প্রজন্মের এবং তরুণরা অনেকটাই সচেতন covid 19 সংক্রমণ নিয়ে। আর সেই বয়সটা হল ২২ থেকে ৩৩। তারা যেমন নিজেরা লকডাউন মানছে। তেমনই দেশের সামনে কি ধরণের বিপদ অপেক্ষা করছে তাও বাড়ির বড়দের বুঝিয়ে বলছে। তাই এই যুবসমাজ ও বাড়ির ছোটোদের কথা শুনে বাড়িতে থাকা উচিত।

Covid 19 এর বিরুদ্ধে অযথা আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয় :-

Covid 19 বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় অযথা আতঙ্কিত হওয়া একদম উচিত নয়। কারণ এর জন্য আপনার আশেপাশের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। এর ফলে জনজীবনে ব্যাঘাত ঘটবে।
তাই গুজবে কান দেবেন না, গুজব এড়িয়ে চলুন। আর নিজে সুরক্ষিত থাকুন আর নিজের আশেপাশের লোকজন কে সুরক্ষিত রাখুন।
বিশেষ করে ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সী লোকজনের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

Covid 19 বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বই জিতবে আর covid 19 হাড়বে।

ঠিক ভোর ৪ টে। গোটা রাজ্য শীতের চাদরে ঢাকা । মাসটা হল মার্চ । শীতের আমেজ এখনো ভোরের দিকে বর্তমান। সকালের সাথে পা মিলিয়েই আসতে আসতে জেগে উঠতে থাকে শহর । চোখে পড়ে একদিকে যেমন চায়ের দোকানে উনুন জ্বালানোর দৃশ্য, অন্যদিকে আবার প্রাতঃভ্রমণে বয়স্কদের তর্ক আড্ডা গল্প , অফিস স্কুল কলেজ যাবার তাড়া। কী সুন্দর সকাল তাই না?? দিনটা ছিল ১৬ই মার্চ । তারপর দিনই রাজ্যের বুকে নেমে আসে এক অন্ধকার । অন্ধকারটির নাম করোনা কোভিড ১৯।এক ছোঁয়াচে রোগ যার জন্য অতিষ্ঠ গোটা বিশ্ব । পাশাপাশি এই রোগীর সংস্পর্শে থাকলে সুস্থ ব্যক্তি হচ্ছেন আক্রান্ত ।বিশেষজ্ঞদের মতে এরকম রোগ ১০০ বছর পর পর আসে । এবং এই রোগের ছড়িয়ে পড়ার জন্য এটিকে মহামারী আখ্যা দেওয়া হয় ।এই রোগের সূত্রপাত হয় চিনে ।তারপরই এটি ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। ২০০২ সাল থেকে চীনে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া সার্স (পুরো নাম সিভিয়ার এ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) নামে যে ভাইরাসের সংক্রমণে পৃথিবীতে ৭৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল আর ৮০৯৮জন সংক্রমিত হয়েছিল। সেটিও ছিল এক ধরণের করোনাভাইরাস।

নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে নানা নামে ডাকা হচ্ছিল, যেমন: 'চায়না ভাইরাস', 'করোনাভাইরাস', '২০১৯ এনকভ', 'নতুন ভাইরাস', 'রহস্য ভাইরাস' ইত্যাদি।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় কোভিড-১৯ যা 'করোনাভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। করোনাভাইরাসে হওয়া রোগের নতুন নাম 'কোভিড-১৯'

১৭ মার্চ ২০২০ , প্রথম রাজ্যে করোনা আক্রান্তের হদিস মেলে। তার আগে অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যে এবং দেশে এই জীবানু হানা বসায়। তারপর থেকেই সকাল গুলো থাকে না উজ্বল, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্কের পর্দা । ২১ শে মার্চ ছিল কলকাতা তথা রাজ্যের কোলাহল শোনার আপাতত শেষদিন তা বোঝেনি বাংলাবাসী । ২২ শে মার্চ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সারা দেশজুড়ে পালিত হয় 'জনতা কার্ফু' । এবং সেইদিনই তিনি ২৪ শে মার্চ থেকে প্রথম লকডাউন ঘোষণা করেন। প্রথম লকডাউন ঘোষণা করেন ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত । এদিন ভারতের আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৬৪ ।এবং বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৩৪০০ । এর ফলেই আমাদের দেশেও চালু করা হয় লকডাউন ।গোটা দেশ তথা রাজ্যে তৈরি হয় এক গৃহবন্দি অবস্থা । অনেক জায়গায় এই লকডাউন মানা হয় কোথাও আবার চোখে

পড়ে উপচে পড়া ভিড়। দ্বিতীয় দফায় লকডাউন ঘোষণা করা হয় ১৫ ই এপ্রিল থেকে ৩ রা মে পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফায় লকডাউন বাড়ার সাথে সাথে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার ও বাড়তে থাকে। দেশে আক্রান্তের সংখ্যা হয় ১১১৪৫। প্রথমবারের জন্য বন্ধ থাকে পয়লা বৈশাখ ।দীর্ঘ দিন ধরে সব বন্ধ থাকায় দিন দিন অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। তৃতীয় দফায় লকডাউন বেড়ে দাঁড়ায় ৪ঠা মে থেকে ১৭ ই মে। এবং লাফিয়ে বাড়তে থাকে আক্রান্তের সংখ্যা। ৩রা মে অনুযায়ী দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৭৩৮৮।এবং রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৯২২। এদিকে সব কাজ বন্ধ থাকায় দেখা যায় পেট চালানোর তাগিদ। চতুর্থ দফায় লকডাউন ঘোষণা করা হয় ১৮ই মে থেকে ৩১শে জুন পর্যন্ত। এদিনের হিসাব অনুযায়ী দেশে আক্রান্তের সংখ্যা হয় ১০০১৭২ এবং রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৫৭৬। লকডাউন চললেও করোনা বেড়ে চলতে থাকে ঝড়ের বেগে। এবং পঞ্চম দফায় ১লা জুন থেকে ৩০শে জুন লকডাউন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী ।এর নাম দেওয়া হয় অনলক ১। পঞ্চম পর্যায়ের ঘোষণার সময় সমগ্র দেশ জুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ এবং মৃত্যু ৫০০০ এর ছাড়িয়েছে। আগামীদিনে এর আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সংকেত পাওয়া গেছে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞমহল থেকে।

এই করোনা ভাইরাস কী এটি মানুষের দেহে কাজই বা করে কী করে সেটাও সবার জানা দরকার । ছোটবেলায় পড়েছিলাম আমরা সকলেই যে ভাইরাস কোনও কোষ নয়! এটি জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী একটি বস্তু। আসলে ভাইরাস এক রহস্যময় মাইক্রোবিয়াল, একটি আবরণী যাকে ভাইরাস কোট বা ক্যাপসিড বলা হয়, সেটি ঢেকে রাখে কিছু প্রোটিন, কিছু প্রোটিনের সাথে যুক্ত কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট (লিপিড)। এবং নিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ DNA বা RNA এও এই আবরণীর ভিতরে থাকে, যাকে অনেকে জিনোম-ও বলে থাকেন।

প্রত্যেক ভাইরাসেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। DNA / RNA এর গঠন বা প্রোটিন বা গ্লাইকোপ্রোটিন এগুলোর ওপর নির্ভর করে একটি ভাইরাসের চরিত্র। কোনও ভাইরাস কীভাবে কাজ করে তা নির্ভর করে এগুলির জৈবরাসায়নিক গঠন এবং ক্রিয়াকলাপের উপর। sars-cov-2 নামক করোনাভাইরাস একটি একতন্ত্রী RNA ভাইরাস, যে কিনা নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি বদলে ফেলতে পারে। এবং এই বদলের কারণ হল মিউটেশন।

আমাদের দেহের কিছু প্রোটিন যারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় হোমিওস্টেসিস বা সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে, ভাইরাস থেকে সৃষ্ট কিছু প্রোটিন যেমন স্পাইক প্রোটিন এই গুরুত্বপূর্ণ

প্রোটিনগুলোকে ঠিক মতো কাজ করতে দেয় না যা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং ফুসফুসের বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই রোগ টিকে SARS বা severe acute respiratory syndrome ও বলা হয়।

এই মুহূর্তের বিভিন্ন গবেষণায় যে দেখা যাচ্ছে এই ভাইরাসের জিনোমের রূপান্তরগুলি খুব দ্রুত এবং তাৎপর্যপূর্ণ। সংক্রমিত মানুষদের দেহ থেকে আইসলেট করা বিভিন্ন দেশের ভাইরাসগুলোর জিনোমএই ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। উহান এর ভাইরাসের প্রকৃতি'র থেকে ভারতীয় স্ট্রেন (প্রকৃতি) এবং ইতালিয়ান স্ট্রেন (প্রকৃতি) এর থেকে আলাদা। সোজা ভাষায় ক্রমাগত মিউটেশনের ফলে এর জিনোম পরিবর্তিত হচ্ছে।

এই ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার কি তাহলে কোন উপায় নেই? অবশ্যই আছে এবং সেটা হল নিজেদের সচেতনতা। আমরা যদি সচেতন হই তাহলে আশা করা যায় আমরা নিজেদের এবং আমাদের পরিবারের সকলকে সুস্থ রাখতে পারবো।

যে সতর্কতাগুলো অবলম্বন করা উচিৎঃ

1. শরীরে জলের ঘাটতি হতে দেবেন না, যদি গরম জল খাওয়া যায় চেষ্টা করুন খাওয়ার। এতে ভাইরাস মরে যাবে না, কিন্তু আপনার শরীরের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে।
2. এখন দুরত্ব বজায় রাখুন, সকলের থেকে।হাঁচি, কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখুন। হাত ধুয়ে নিন সঙ্গে সঙ্গে।
3. হ্যান্ডওয়াশ, স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন বাইরে থেকে ঘরে এলেই, তবে ঘরে থাকলেও হাত ধুতে থাকুন।
4. বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন। অযথা আতঙ্কিত হবেন না। আর গুজবে কান দেবেন না।
5. আমরা সবাই মিলেই পারি Covid 19 কে আমাদের দেশের, আমাদের ঘরের ক্ষতি করা থেকে প্রতিরোধ করতে পারবো ।

এই দুঃসময়ে সবাইকে থাকতে হবে সবার পাশে । আমাদের শিবপুর সৃষ্টিও সেই পথেই সামিল হয়েছে। বহু অসহায়, দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেছে। সেই মতোই চলছে সৃষ্টির কাজ।

- আমাদের শহর হাওড়ায় ৩০টি অসহায় পরিবারের জন্য আমরা এক সপ্তাহের রেশন পৌছে দিতে পেরেছি হাওড়া সিটি পুলিশের সাহায্য নিয়ে ৩০ শে মার্চ ।
- বেলপাহারী ঝাড়গ্রাম জেলাতে আমাদের প্রথম ত্রাণের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, আমরা ৩রা এপ্রিল সফলভাবে প্রায় ৯০ টি পরিবারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেছি।
- ৯ ই এপ্রিল,সৃষ্টি ঝাড়গ্রাম ও বেলপাহারীর সিঙ্গাদুবা, রিমরাডাঙ্গা, বাঁশপাহাড়ী, শুশনিজীবী নামে চারটি গ্রাম জুড়ে ১১০ টির বেশি পরিবারকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করেছে।
- ২৪ শে এপ্রিল, আমরা বেলপাহারীতে ১১০ টি পরিবারকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেছি, যাম্বোনি এবং কেন্দাদুমারী নামে দুটি গ্রামে।
- ২৭ শে এপ্রিল শিবপুর সৃষ্টি মধ্য হাওড়ায় বসবাসরত দুস্থ পরিবারের জন্য ত্রাণসেবা করে। স্বতন্ত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি হস্তান্তর করা হয় ।
- বেলপাহাড়ির জনগণের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে, আমরা আবারও সেখানে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করি। এই সময়, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের দল রাঙ্গামেটিয়ায় পৌঁছায় এবং ৩০ টিরও বেশি পরিবারকে খাবারের সামগ্রী তুলে দেয় ।
- সৃষ্টি কিছু শুকনো খাবারের প্যাকেট বিতরণ করে (মুড়ি , বিস্কুট এবং চিড়া,প্যাকেটজাতীয় পানীয় জল)নিকটবর্তী ডুমুরজলা বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী ৬০ টি পরিবারের মধ্যে ।
- আমাদের ত্রাণ প্রয়াসের অষ্টম পর্বের অংশ হিসাবে আমরা হাওড়ার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পাশের বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী ৬০ টি পরিবারকে খাদ্য উপকরণ বিতরণ করি।

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

একুশদিন হোম কোয়ারেন্টাইনে হাওড়া ব্রিজের আত্মকথা

~ শর্মিষ্ঠা জানা

শুনেছ কোনোদিন আমার চাপাকান্না!
দেখেছ আমার বুকের দগদগে ক্ষতগুলো!
হ্যাঁ ক্ষত দেখেছ তো, ওপর ওপর মেরামতিও তো করেছ...
কিন্তু ভেতরটা!! ভেতরটা যে হাহাকারে ফেটে যায় কোনোদিন তা মুছে দিতে পারবে তো...!

হ্যাঁ তোমাদেরই বলছি...
আমার বুকের ওপর দিয়ে দিন-রাত্রী অবাধ তোমাদের আনাগোনা,
চালিয়ে নিয়ে যাও কত বৈচিত্র্যময় যানবাহন, বয়ে নিয়ে যাও কত হাজার টনের বোঝা....

হ্যাঁ আমি জানি, আমাকে তোমরাই তৈরী করেছিলে, তাই তোমাদের কাছে ঋণী আমি, সে ঋণ পরিশোধ তো করতেই হবে আমাকে...
এই সাতাত্তর বছর ধরে আমি মাশুল গুনে চলেছি প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত....

সন্ধ্যে নামে যখন সবাই ঘরে ফিরে যায় আর আমি.... আমি সেজে উঠি আলোর রোশনাইয়ে, তোমরা দেখে মুগ্ধ হও, ক্যামেরা বন্দী করো, আমার ফ্ল্যাশব্যাক ভালো লাগে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধও করনা...
আমারও মাঝেমাঝে ইচ্ছে করে জানো তোমাদের দেখে মুগ্ধ হতে, মানে তোমাদের মানসিকতার পরিবর্তন দেখে মুগ্ধ হতে...

তোমরা তো সারাদিন বলো প্রচুর খাটুনি হয়েছে, তারপর রাত্রে টানা ৬-৭ ঘন্টা ঘুমিয়ে সমস্ত ক্লান্তি পুষিয়ে নাও...

কিন্তু আমার বিশ্রাম? আমি কাকে বলবো? কী বলবো? কে শুনবে আমার কথা?

আসলে তোমরা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত প্রাণী, গোটা বিশ্ব তোমাদেরই হাতের মুঠোয়...

আচ্ছা আমার কথা নাহয় ছেড়েই দাও....

আমাকে যার বুকে গড়ে তুলেছ সেই হুগলী নদ...তোমরা নাকি "গঙ্গা" বলো, সেই পবিত্র জলরাশিতে তোমরা অনাচারে দূষণ করে চলেছ দিনের পর দিন...

আচ্ছা তোমাদের গঙ্গার কথাও বাদ দাও...

তোমরা যার বুকে ঠাঁই পেয়েছ, সেই মাতৃভূমি বসুন্ধরা তার প্রতিও অনাচারের সীমা নেই তোমাদের...

এতো পাপ ধ্বংস করার জন্য আবার পবিত্র গঙ্গাতেই স্নান করো, অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজো করার মতো...

ধন্য তোমরা হে মানবজাতি,, ধন্য.....

হরতালে ওই কয়েক ঘন্টার বিশ্রামে ক্লান্তি মেটে না গো, যেভাবে তোমরা আমাকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ গোছাও....

যাই হোক, জানো! দীর্ঘ সাতাত্তরের পর আমি, "রবীন্দ্রসেতু" ওরফে "হাওড়া ব্রিজ" টানা একুশের বিশ্রাম, একটু খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে পারছি, আমার নীচে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটাও একুশ দিন দূষণমুক্ত থাকবে...

হয়তো আমি বিশ্রাম নিতে পারছি, তবে তোমরা স্বার্থান্বেষী মানুষেরা নিজেদের স্বার্থ অন্বেষণে আমাদের সৃষ্টি করেছ বলেই আমরা জোটবদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিচ্ছি এটা ভেবে নিও না যেন..... শুধু

একটু মানসিকতার পরিবর্তন করতে বলছি...

তোমরাও একুশদিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে বিশ্রাম নাও, এই কোভিড নাইন্টিন তোমাদের কিচ্ছু করতে পারবেনা, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।

"চাপিয়ে দেওয়া কত টন ভার নীরবে নিয়েছি মেনে।
ফ্ল্যাশব্যাকে জমা সময়ের ঋণ বিশ্রামে নিয়েছি কিনে।
করবোনা তবু অভিসম্পাত, ধন্য তোমরা হে মানবজাতি।
চালিয়ে যাও তোমাদের প্রতিহত অভিযান, ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও অদৃশ্য শত্রুদের সংহতি।"

-ইতি হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্রসেতু)

ছবি – মনোজিৎ দত্ত

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

আজ সকালে

~ সুমিত গাঙ্গুলি

হবে ওই ৯ টা নাগাদ,

দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ওই মোড়টিতে

হঠাৎ দেখি, এক তীব্র সাইরেন ধ্বনি দিয়ে চলে গেলো এক শববাহী গাড়ি।

অল্প একটু দেখা গেলো দেহ,

অল্প একটু দেখা গেলো মুখ,

আকালের দিনে,গায়ে পড়েছে কিছু ফুল

যা দেখে কেঁপে উঠেছিল বুক।

এ যে,

একটা ছোট্ট ছেলে

বছর নয় কি দশ,

ছেড়ে গেলো সে ইহলোকের

মায়াত্যাগ করে।

কেউ বললো সাবধান, সরে যাও, হতে পারে তার করোনা

কেউ আবার বললো যে যাওয়ার সে চলে গেছে, এ সব এখন ছাড়ো না।

মহামারীর বিষাক্ত আবহাওয়ায় জর্জরিত এই

পৃথিবী।

যেখানে মৃত্যু চারিদিকে বিরাজমান

এতো কিছু,তবু কমেনি লোভ

তাও এখানে দৃশ্যমান।

জানিনা, আমি বা আমরা কি ভবিষ্যৎ দেখবো?

নাকি,

অচিরেই মিশে যাবো ভবিতব্যের পথে ওই শিশুটির মতো।

তবু রোজই তিলতিল করে জুড়ছি ,সঞ্চয় আশা

চেষ্টা করছি বুক চিতিয়ে লড়বার,

মন দিয়ে দৃঢ়তা কে করতে চাইছি,

আবদ্ধ।

নতুন সূর্য কে প্রণাম জানাই প্রতি দিন

এক নতুন দিন উপহার দেওয়ার জন্য,

কেই বা জানে হয়তো আমরাও হয়ে যাবো

নিস্তব্ধ।

চেষ্টা করছি বাঁচবার

চেষ্টা করছি বাঁচাবার

নিচ্ছি অনেক সংকল্প

যদি বা কিছু বাস্তবায়িত হয়

আবার কিছু হয়েই থাকে কল্প।

ঈশ্বর করোনাময়

~ একলব্য

ঝড় উঠেছে,
সুপ্ত হয়ে,
বিভীষিকার মতো
কালের করাল গ্রাসে
মানব সভ্যতার অতিদংশনকে
শান্ত করতে এসেছে সে।

নাহ!
কোনো বৃহদাকার দৈত্য কিংবা পশু নয়,
মাইক্রোচিপ এর অনুবক্ষণিক যুগে,
সে এসেছে এক অণুজীব হয়ে।

তবে কি এটাই কলিযুগের শেষ?
মহাদেব এর রুদ্রাতাণ্ডব নয়,
রামের ধনুক, পরশুরাম এর কুঠার,
কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রাম নয়;
হ্যামলিনের বাঁশির মতো
সে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুমিছিলে।

আমি শুনতে পাচ্ছি।
আমি শুনতে পাচ্ছি আমার ভয়ার্ত আর্তনাদ।
দেখতে পাচ্ছি নিজের জরাজীর্ণ চেহারা,
শুধু এক্স-রে প্লেটের মতো,
পরে রয়েছে গোটা শরীর I
রাস্তার পাশে পরে আছি জঞ্জালের মতো I

একমুঠো চাল,
শুধু একমুঠো চালের জন্য
দরজায় দরজায় ঘুরে,
খেওখেইর রাজনীতি ছেড়ে
খেয়ে বাঁচার তাগিদে ধুকছে সবাই।
আসায় বেঁচে রয়েছে চাষা থেকে রাজা I
তবু বাঁচবেনা কেউ!
মৃত্যু যেন হবেই।
হয় করোনায়; নাহয় করুণায়।।

করোনা

~ তপন হাজরা

ভয় পেয়ো না, ভেঙে পড়োনা,
সাবধানে থাকলে কি করবে করোনা !

সাধু হও সাবধান, চোর হও সাবধান
দেশেও সাবধান, বিদেশেও সাবধান
ভাইরাস করোনা শত্রু সবার.

তাই লক ডাউন মানা দরকার,
স্বাস্থ বিধি মানা দরকার
সামাজিক দূরত্ব রাখা দরকার...

~~~ ~~~ ~~~
~~~

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

ফুলটুসি

~ সন্দীপ বাগ

ট্যানারি উঠে গেছে কবে। তবুও শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় পার্ক সার্কাস স্টেশন এলেই পচা চামড়ার গন্ধটা নাকে আসবেই, চোখ বোজা থাকলেও। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে পার্ক সার্কাস এসে গেছে। ফুলটুসি জানে দক্ষিণ শাখায় এর চেয়ে নোংরা স্টেশন আর নেই। ময়লা আবর্জনায় ভর্তি। প্রথম প্রথম নাকে গন্ধটা লেপ্টে শরীরটা গুলিয়ে উঠত, শাড়ির আঁচল চেপে অগুনতি চোর ছিনতাইবাজ, পাতাখোর, চুল্লুখোর পেরিয়ে ঘিন্জি পথ ধরে চার নম্বর ব্রীজের দক্ষিণের রাস্তাটায় উঠতো। এখন সয়ে গেছে, নাকে চাপা ছাড়াই হন হন করে হেঁটে ভীড় কাটিয়ে হাঁটতে পারে সে। নিত্য সঙ্গী মালতিকে জিজ্ঞেস করে - এত নোংরা এলাকার নাম পার্ক দিয়ে কেন রে ? সে বলে - কী জানি? একদিন ভীড় ঠাসা স্টেশন একা পেরোবার সময়ই ওর হাত ধরে টেনেছিল হাতকাটা আব্দুল। ফুলটুসি সাইড হয়ে কোমরে শাড়িটা জড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে বলেছিল - এই যে দাদা এটা কী হল? একা মেয়ে গেলেই সকাল থেকেই টানাটানি শুরু হয়ে যায় নাকি? আব্দুল পাশ কাঠিয়ে মুহূর্তে ধাঁ। আসলে সে বুঝতে পারেনি একা একটা ছাপোষা মেয়ে ওভাবে রুখে দাঁড়াবে। ছিনতাই না করলে সংসার চলে না ওর। ঘরে ছটা পেট ওর ছিনতাই এর দিকে তাকিয়ে। এদিকে চারিদিকে ঘন ঘন ক্যামেরার চক্করে মাল সটকানো খুব হুজ্জতির। সে তারকাটা গনেশকে বলছিল - সেদিন লেডিস কামরায় ওঠার মুখে একটা হ্যাচকা মেরে গলার হার হাতে নিয়ে দিখি ওটা শালা নকল। তিরিশ বছর লাইনে আছি, আমার চোককেও ফাঁকি দিচ্চে জানিছ।

ফুলটুসি রোজ সকালে বহরু স্টেশন থেকে ছটা ছেচল্লিশের লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরে আটটা নাগাদ এখানে নেমে পাম এ্যাভেনিউ, বন্ডেল রোডের চার পাঁচটা বাড়িতে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে আবার দুপুরে একটা তেইশের লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরে ফিরে যায়। বাড়ি স্টেশন থেকে মিনিট কুড়ি হাঁটা পথে। এখন অবশ্য টোটো হয়েছে। ওর বর শ্যামলের রাস্তার পাশের ঝুপড়িতে একটা পান বিঁড়ির দোকান আছে, বিড়ির সঙ্গে বিলিতিও বেচে লুকিয়ে। ফেরার সময় দোকান বন্ধ করে সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করে ওর জন্য। দেরি হলে ও বলে দেয় বরকে ফোনে - তুমি চলি যাও। আমার এট্টু দের আচে। ওর

দোকানে কলেজের ছেলেরা এসে শুধু বিলিতি খোঁজে, আজকাল কটা মেয়েও সঙ্গে থাকে। যেদিন বেশি বিলিতি বিক্রি হয় সেদিন শ্যামলের মুড দারুণ। ফুলটুসিকে সামনের হ্যান্ডেলে বসিয়ে - এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো - গাইতে গাইতে নিয়ে যায়। ওর গালটা টিপে বলে - তুমি বলো। ও বোঝে আজ বরের মুড দারুণ ভালো। রাতে দুঃখ আছে। দুটো পিঠো পিঠি মেয়ে আছে ওদের, খিচুড়ি স্কুলে যায়।

রোজ সকালে প্রথম যে দিদিমণির বাড়ি কাজে যায় সেখানে ওকে দুটো টাটকা সেঁকা পাউরুটি আর চা খেতে দেয় কাজের পরে। অন্যরা কেউ কেউ বাসি কিছু থাকলে দেয়। সেগুলো ওর সঙ্গে থাকা ঝোলানো ব্যাগে পুরে নিয়ে আসে। ও যখন আসে রোজ আব্দুল আড়ালে থেকে ওকে দেখে। সাদা ফুলের লাল ছাপা শাড়ি পরে ও একদিন হন হন করে হাঁটছিল তখন ও শুনলো আড়াল থেকে তারকাটা গনেশ আব্দুলকে বলছে - দেখ তোর ফুলটুসি কেমন কারিনা কাপুরের মতো সেজে গুজে যাচ্ছে। আব্দুলের হাসি মাখা মুখটা আড়চোখে দেখে হন হন করে হেঁটেই গেল ফুলটুসি । একটু এগিয়ে নিজে ভীষণ হাসলো। দেখতে ওকে মন্দ নয়। রঙটা বেশ ফর্সা। গাঁয়ে মেয়ে ডাগর হবার আগেই কারোর হাতে তুলে দিতে হয়। নইলে বিপদ বাড়ে। সেজন্যই সিক্স ফেল পনেরো বছরের ফুলটুসি কে ত্রিশ বছরের শ্যামলের সঙ্গে বে দিতে হলো। জীবণে কেউ ওরম ভাবে তাকায় নি ওর দিকে। হাতকাটা আব্দুল ওর দিকে যেরকম আজ ভালোবেসে তাকালো। ওর নাম সেই থেকে কলকাতায় হয়ে গেল ফুলটুসি। যদিও আঁধার কার্ডে ওর নাম মঙ্গলা সাঁপুই। ও নিজেকে ফুলটুসি বলতেই ভালোবাসে। ও দেখে ওর আসার পথে রোজ আব্দুল একলা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর তখন নিজেকে ঋতুপর্ণা ঋতুপর্ণা লাগে। বছর পঁচিশের ফুলটুসিকে একটু সাজলে অনেক নায়িকা ফেল আছে। অনেকেই ওকে আজকাল ফলো করে। আব্দুল জানিয়ে দিয়েছে - তোরা ফুলটুসির পেছনে লাগলে শালা জানে মেরে দেবো। দেখিস নি ওর শাঁখা সিদুর আচে। বালিগঞ্জের ছিচকে প্যাংলা কার্তিক একদিন না জেনে ওকে বলেছিল - কি গো সারা মাস গতর খাটিয়ে কত পাও? যাবে নাকি? আব্দুল ওকে ওই দিনই হাত পা ভেঙে চিত্তরঞ্জনের অর্থোপেডিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। মালতির থেকে এটা ফুলটুসি পরে জেনেছে। ও এই ক বছরে জেনে গেছে শীত গ্রীষ্ম ঝমঝম

বৃষ্টিতেও হাতকাটা আব্দুল সকাল আটটা আর দুপুর একটা পনেরো তে ওর অপেক্ষায় থাকবেই। শুধু দূর থেকে কয়েক মিনিট দেখলেই ওর শান্তি। এই সময় কোনো এ্যাকশনে যাবে না, কয়েক হাজার টাকা দিলেও।পরীক্ষা করার জন্য একদিন পরের ট্রেনে এসেছিল ও, আব্দুলকে ওখানে দেখতে পায় নি।

ফেরার সময় ফুলটুসির রোজই তাড়া থাকে। একদিন দৌড়ে দৌড়ে আসছে ট্রেন ঢুকে পড়েছে দেখে। প্ল্যাটফর্মের সামনে চিৎকার চেঁচামেচি - জটলার ভীড় ঠেলে দেখে নীচে পড়ে আব্দুল যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওর গাল ক্ষুর দিয়ে কাটা। রক্ত ঝরছে। বাকিরা পালাচ্ছে ভয়ে। ওর ট্রেন এসে গেল প্লাটফর্মে। উঠি উঠি করে না উঠে আবার গেল একটু দূরে আব্দুলের দিকে। একলা আব্দুলের মুখের কাটার রক্তটা বন্ধ করতে ফুল ফুল শাড়িটা ছিঁড়ে চেপে ধরে রইলো খানিকটা। কোথায় থাকো তুমি? ঘরে খবর কর। ফোন করো। আব্দুল কথার জবাব দেয় না। ধরাধরি করে স্টেশন মাস্টারের ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে ডেটল মলম লাগিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।আব্দুল বলে - তুমি ঘর যাও, ঘরের নোক অপেকখা করচে। এক ঘন্টা পরে দুটো তেইশের ট্রেনটা ধরে সেদিন ফিরেছিল। পরের দিন তার আসা যাওয়ার পথে আব্দুল ছিল না। তার পর থেকে আব্দুল কে দেখতে পাচ্ছে না ফুলটুসি। ওর অবস্থা পাগলের মতো। কি হলো আব্দুলের? কাউকে জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। সারা দিন কোনও কাজ করতে পাচ্ছে না। খেতেও ভালো লাগছে না। ওর বর জিজ্ঞেস করে - কি হলি তোমার? রান্নায় নুন তেল দিতে ভুলে যাচ্চো? মেয়েদের দিকি মন নেই। শলীল খারাপ? ও বলে - কিছু না। প্রায় দিন পনেরো পর দেখে আব্দুল আবার দাঁড়িয়ে। দৌড়ে যায়। কেমন আছো? কাটা অংশের শক্ত ব্যান্ডেজে হাত দেয়। এর পর রোজ ফেরার পথে ফুলটুসি একটু আগেই স্টেশনে আসে যাতে ওদের পাঁচ দশ মিনিট কথা হতে পারে। ফুলটুসি বলে - এ লাইন ছাড়ো। ভদ্র কাজ করো।

আব্দুল বলে - কে দেবে আমায় কাজ। বোন হতে গিয়ে মা মরে গেল, মা কে মনে পড়ে না। বাপ কে? তা তো জানিই না। একবার ট্রেন গন্ডগোলে তিন দিন ফুলটুসি আসতে পারে নি। আসার সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল কাছে গিয়ে ভালো করে তার ফুলটুসিকে দেখেছিল। বলে - সত্যি করে বলো তো আমার কথা মনে পড়ে নি। ফুলটুসি বলে - মরণ, আমার বুঝি বর নেই। একটু খারাপ লাগে আব্দুলের। নিজেই বলে - সে তো ঠিক। আমার যে কেউ নেই গো। এরপর আবার বেশ কিছু দিন আব্দুলকে দেখতে পায় না।

সে ভাবল আব্দুল আর চায় না তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ফুলটুসির তো কলকাতায় আসা বেকার লাগে আব্দুলকে না দেখলে। নিজেকে নিজেই চড় মারে কেন সে বলতে গেল আব্দুলকে না দেখলে তার কিছু যায় আসে না। কয়েকদিন পর আবার দেখে আব্দুল দাঁড়িয়ে। আবার সে দৌড়ে যায়। কোথায় ছিলে? তাতে তোমার কী? একন তাড়া আছে।একটার সময় দাঁড়াবে কথা আচে। বলে সে চলে আসে। একটা দশে পৌঁছে দেখে আব্দুল দাঁড়িয়ে। আব্দুল বলে - ভোট ছিল তাই পুলিশ চালান করি দেচিল। ফুলটুসি বলে - মেয়ে মানুষের চোক দেকি বুঝ না সে তোমারে ভালোবাসে কিনা। এটা বলি দিতে হয়। এর পর ওরা রোজ দেখা করে, সুখ দূঃখের কথা কয়। দুজন দুজনের ভালোবাসায় বিলীন হয়ে যায়। তারপর চলে যায়। আসতে না পারলে বলে দেয়। মকরে পিঠে পুলি হলে একটু ওর জন্য নিয়ে আসে। যে সব বাড়ি কাজ করে সেখানে ভালো খাবার পেলে আলাদা করে নিয়ে এসে ওকে বসিয়ে খাইয়ে বাড়ি যায়। একবার ওকে একটা লুঙ্গি কিনে দিয়েছিল ঈদের আগে। আব্দুল সেটা পরেছিল ঈদের দিন। ফুলটুসির ভালোবাসা পেয়ে নোংরা কাজ করতে মন চায় না। কিন্তু কি করে যে বাকিদের পেট ভরাবে সে জানে না। ফুলটুসি একদিন বলেছিল - মুটেগিরি বা ঠেলা চালাতে শিখতে পারো নি।

এই সব কথা আর দেখা হতে হতে সারা দেশ জুড়ে হঠাৎ লকডাউন। এলোমেলো করে দিল সবার জীবন। দু মাসে পড়ল এই লক ডাউন। আব্দুল আর ফুলটুসিকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। ওদের কোনো যোগসূত্র নেই। তারা জানে না তাদের আর কোনোদিন দেখা হবে কিনা। যে সব বাড়িতে ফুলটুসি কাজ করতো দু মাসের মাইনে আর বকশিস দিয়ে বলে দিয়েছে ওদের আর ঠিকে ঝি লাগবে না। কলকাতার গৃহস্থ বাড়িতে গ্রাম থেকে আসা কাজের মেয়েদের আর কেউ চাইছে না। হয়ত আর চাইবেও না। আব্দুল আজ পুরো বেকার। কোথাও কিছু কেউ দিতে এলে মারামারি করে না। শেষে পড়ে থাকলে নিয়ে বাড়ি যায়। একটু ভাগ পেলে খায়। প্ল্যাটফর্ম শুয়ে শুয়ে ফুলটুসি কেমন আছে ভেবে চোখের জল মোছে। ফুলটুসি ভাবে সব জায়গার খবর টিভিতে দেখায় কিন্তু পার্ক সার্কাস স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ছবিটা কেন দেখায় না? রাতে বর ঘুমিয়ে পড়লে বাইরে বেরিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। নিজের ভেতরের ভালবাসার আগ্নেয়গিরির গরম স্রোত চোখের জল হয়ে হু হু শব্দে বহরুর মাটি ভেজায়।

প্রথম বর্ষ - জুন সংখ্যা
উদ্ভাবন
ডিজিটাল পত্রিকা

করোনা

~ ঋষভ মিত্র

এককোষী এক তান্ডব,
দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে অস্তিত্বের খেলা;
পরিজন বা পরিবেশ! কার বান্ধব তুমি?
অহর্নিশি মিলিয়ে দিলে প্রাণের পরিসর।
মানবের হিমালয় দর্শন পরিসীমা,
তা নাকি জলন্ধর!
ভাইরাস না প্রশ্বাস, কার সঙ্গী তুমি?
বাড়ির একাকী জননী?বৃদ্ধা ঠাকুমা?
নাকি পুত্র বঞ্চিত পিতা-মাতা?
হায়!লালসা,অপরাধ-শোষণ সব এখন
বন্ধি ওই চৌকাঠে।
গরিবের ক্ষুধার্ত পেট,জীবের প্রাণসঞ্চার;
মন্দের ভিড়ে যত্ন করা ভালটাও
বড়ই বেরঙীন,ফ্যাকাসে।
আগমন ব্যাতিত গমন প্রাপ্য
এসো না ফিরে ,চাইনা ফেরাতে!
তুমি থেকো ধ্বংসের অতীত হয়ে,
মানুষ হয়তো পরিবেশ চিনেছে।
ওই জানালার ফাঁকে এক চিলতে রোদে;
দিওনা হাসতে চড়াইটাকে
আমার দম বন্ধের দেশে।

রোমাঞ্চের অন্তঃপুরে

সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ যে রহস্যের গন্ধ মাখা হবে তা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের চারপাশে এমন অনেক রহস্যময় ঘটনা ঘটে চলে যার মাথামুন্ডু বোঝা দায়। রহস্য ব্যাপারটা যেমন ভীষণ কৌতুহলপূর্ণ, তেমনই ভূত শব্দটার মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে অজানা রহস্য। ভূত আছে কি নেই তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর। কিন্তু বেশ কিছু paranormal activities খুলে দিচ্ছে অজানা রহস্যের দরজা। আমরা চেষ্টা করেছি ভারতবর্ষের এরকমই কিছু রহস্যময় ও ভৌতিক ঘটনা আপনাদের সামনে একত্রিত করার —

- জাতিঙ্গা, আসাম
- রহস্যময় হিমালয়
- টুইন টাউন
- বৃন্দাবনের নিধিবন
- এলিয়েন ঘাঁটি
- সঙ্গীত স্তুভ, হাম্পি
- রামোজি ফিল্ম সিটি
- ভানগড় দুর্গ
- টানেল নং ৩৩
- ডাও হিল ফরেস্ট
- খইরাতাবাদ সাইয়েন্স কলেজ
- মুসৌরি স্যাভয় হোটেল
- রহস্যময়ি তিলোত্তমা একপলকে
  - কলকাতা যাদুঘর
  - রাইটার্স বিল্ডিং
  - জাতীয় গ্রন্থাগার
  - হেস্টিং হাউস
  - রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব
  - পার্ক স্ট্রিট কবরস্থান
  - রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন

আসামের জাতিঙ্গা

আসামের ডিমা হ্যাসাও জেলার চিরসবুজ পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত এক গ্রাম জাতিঙ্গা। বর্তমানে প্রায় ২,৫০০ আদিবাসী মানুষ এখানে বসবাস করেন। আপার সৌন্দর্য্যে ভরা মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য গ্রামটিকে করে তুলেছে প্রশংসনীয়। কিন্তু এই সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ গ্রামেই ঘটে এক রহস্যময় কাণ্ড। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে আত্মহত্যা করতে। প্রতি বছর মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাগমনকালে [সাধারনত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে] ঠিক সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ১০টার মধ্যে বিভিন্ন গাছ, বাড়ি, পাহাড় ইত্যাদিতে এসে নিজেদের সজোরে ধাক্কা মারে এবং আত্মহত্যা করে। এটি এখানকার রোজকার ঘটনা।

গল্প মনে হচ্ছে? না, অবিশ্বাস থাকলে ঘুরে আসতে পারেন জায়গাটা। আর একারণেই এই গ্রামের নাম হয়েছে পাখিদের 'ভ্যালি অফ ডেথ' বা মৃত্যু উপত্যকা।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এখানে একধরণের উপজাতি বাস করত যারা zeme nagas নামে পরিচিত ছিল।এরাই হল এই ঘটনার প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী। তারা একত্রিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯০৫ সালে ওই স্থানটি Jaintias দের কাছে বিক্রি করে। তারাও একইভাবে এই ঘটনা লক্ষ করেন যে রাতের দিকে মশাল, ফ্ল্যাশলাইট কিংবা কোনো উজ্জ্বল আলো দেখলেই পাখিগুলো এরকম বিক্ষিপ্ত আচরণ শুরু করে। তাদের মতে পাখিগুলো প্রেতাত্মাদের বশীভূত তাই এদের মারা যাওয়াই ভালো। গ্রামবাসীদের এই কথা বিজ্ঞানীরা হেসে উড়িয়ে দেবে এটাই স্বাভাবিক, সুতরাং এই ঘটনাকে ঘিরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়। গবেষকদের মতে যেহেতু জাতিঙ্গাতে ওই সময় মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তনের সময়, সেহেতু ওখানে অত্যন্ত কুয়াশার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যার ফলে পাখিরা দিকভ্রম করে। এরপর তারা যখন আলোর ঝলকানি দেখে সেদিকে তীব্র গতিতে যাবার চেষ্টা করে। পাহাড় বা গাছের সাথে ধাক্কা লেগে কিংবা পরস্পরের সাথে সজোরে ধাক্কা লেগে তারা নিচে পড়ে যায়। এত জোরে আঘাত পাবার ফলে অধিকাংশ পাখিই মারা যায়, কিছু আহত অবস্থায় পড়ে থাকলেও তারা বেশিক্ষণ বাঁচে না। আবার কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, এই এলাকায় অত্যধিক ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপস্থিতি পাখিদের দিক নির্দেশ ক্ষমতা রহিত করে দেয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গবেষকরা আরো কিছু রহস্যময় বিষয় খুঁজে পেয়েছেন, যেমন উপত্যকার 1.5 km দৈর্ঘ্যে এবং 200 mt প্রস্থের সুনির্দিষ্ট স্ট্রাইপে এই ঘটনা ঘটে এবং পাখিদের কেবল উত্তরের দিকেই উড়ে যাবার তথ্য মিলেছে। অর্থাৎ, গ্রামের আলোগুলি যদি দক্ষিণদিকে হয় তখন কিন্তু এই পাখিরা ওই আলোর প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে না। এই পাখিগুলো স্থানীয় গোত্রের পাখি, সাধারণত নিকটবর্তী উপত্যকা বা পাহাড়ের ঢালে বসবাস করে। প্রায় ৪৪ প্রজাতির পাখি এই আত্মহত্যা ক্রিয়ায় অংশ নেয়, তাদের মধ্যে রয়েছে সাদা সারস, সবুজ পায়রা, Hornbill, Tigerbitterns, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, সোনা ঘুঘু প্রভৃতি আরো নানাপ্রজাতি। তবে কেবল জাতিঙ্গার ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলেই যে পাখিদের এরূপ অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায় এমন নয়। এই ঘটনা ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া এবং ভারতের মিজোরামেও দেখা যায়। আজ অবধি যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, গবেষকদের মতে তা যথেষ্ঠ নয়। তাই আজও জাতিঙ্গা পাখিদের মৃত্যুমিছিলকে ঘিরে চিররহস্য বয়ে নিয়ে চলেছে।

রহস্যময় কৈলাস

হিমালয় পর্বতমালা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ হাজার ৭১৮ মিটার উঁচুতে কৈলাস পর্বতকে হিন্দু, বৌদ্ধ আর জৈন ধর্ম অনুযায়ী পবিত্র স্থল বলা হয়। হিন্দুদের মান্যতা অনুসারে ভগবান শিব এই পর্বতেই বাস করতেন। আর সেখানেই ওনার সমাধি আছে। তিব্বতের বৌদ্ধদের অনুযায়ী, পরম আনন্দের প্রতীক বুদ্ধ ডেমচোক (ধর্মপাল) কৈলাস পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা। আর জৈন ধর্মে কৈলাসকে অষ্টাপদ বলা হয়। তাঁদের অনুসারে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋশভহদেব এখানেই শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন।

রহস্যের বিষয়টি হল, আজ পর্যন্ত কোন মানুষই এই পর্বতে চড়াই করতে পারেনি। যেই এই পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করেছে, তাঁরই মৃত্যু হয়েছে। আর এটা নিয়ে অনেক কথাও প্রচলিত আছে। চীনের সরকার কৈলাস পর্বতের ধার্মিক আস্থা দেখে, সেখানে চড়াই করা নিষিদ্ধ করেছে। এটাও শোনা যায় যে, ১৯ এবং ২০ শতাব্দীতে কিছু পর্বতারোহী এই পর্বত চড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই উধাও হয়ে গেছেন।

রাশিয়ার এক ডাক্তার কয়েক বছর আগে কৈলাস মানস সরোবরের যাত্রা করেছিলেন। উনি এই যাত্রার পর দাবি করেছিলেন যে, কৈলাস পর্বতে বাস্তবেই একটি প্রাচীন পিরামিড আছে, আর সেই পিরামিড ছোট ছোট পিরামিড দিয়ে ঘেরা। এর সুত্র গিজা এবং মেক্সিকোর Teotihuacan পিরামিডের সাথে যুক্ত।ডাক্তার এর্নেস্ট মুলদাশিফ (Ernst Muldashev) নিজের স্মৃতিকথায় লেখেন, ওনাকে একবার সাইবেরিয়ার পর্বতারোহীরা বলেছিলেন যে, কিছু পর্বতআরোহী কৈলাস পর্বতের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছেছিল। আর তাঁর একবছর পর বৃদ্ধাবস্থার জন্য তাঁদের মৃত্যু হয়। বিখ্যাত রাশিয়ার চিত্রকার

নিকোলায় রেরিখ এর বিশ্বাস অনুযায়ী, কৈলাসের আসেপাশে শাম্বালা নামের একটি রহস্যময়ি রাজ্য আছে। সেখানে শুধু তপস্বীরা বসবাস করেন।

১৯৯৯ সালে রাশিয়ার তিনি ঠিক করেন যে, কৈলাস পর্বতের রহস্য উন্মোচনের জন্য তিনি ওই এলাকায় যাবেন। ওনার পর্বতআরোহী টিমে ভূবিজ্ঞানী, ভৌতিক বিশেষজ্ঞ আর ঐতিহাসিকবিদেরা ছিলেন। তাঁরা অনেক তিব্বতি লামাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পবিত্র কৈলাসের আশেপাশে অনেক মাস ধরে সময় কাটান। এরপর তিনি একটি বই লেখেন 'where do we come from" সেখানে তিনি কৈলাস পর্বতের যাত্রা নিয়ে অনেক কথাই লেখেন।

তদন্ত করার পর এর্নেস্ট মুলদাশিফ এই সিদ্ধান্তে আসে যে, বাস্তবে কৈলাস পর্বতে একটি মানব নির্মিত পিরামিড আছে, আর এই পিরামিডের নির্মাণ প্রাচীন কালে করা হয়েছিল। উনি দাবি করেছিলেন যে, একটি বড় পিরামিডকে অনেক ছোট ছোট পিরামিড ঘিরে আছে আর সেখানে অলৌকিক ঘটনা ঘটে।সেখান থেকে ফেরার পর এর্নেস্ট মুলদাশিফ লেখেন, 'রাতের নিস্তব্ধতায় পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি আজব ফিসফিস এর শব্দ আসে। এক রাতে আমি আর আমার দুই সহযোগী পাথর পড়ার আওয়াজ পেয়েছি। আর এই আওয়াজ কৈলাস পর্বতের পেটের ভিতর থেকে আসছিল।আমরা ভেবেছিলাম যে, পিরামিডের ভিতরে অন্য কোন মানুষ আছে।" উনি আরও লিখেছিলেন, 'তিব্বতি গ্রন্থে লেখা আছে যে শাম্বালা একটি আধ্মাতিক দেশ, এটা কৈলাস পর্বতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে এই বিষয়ে চর্চা করা আমার পক্ষে কঠিন। তবে আমি পরিস্কার ভাবে বলতে পারি, কৈলাস পর্বতের এলাকা সোজাসুজি পৃথিবীর জীবনের সাথে জড়িত। যখন আমরা তপস্বীদের রাজ্য তথা পিরামিড আর পাথরের দর্পণকে মিলিয়ে একটি যোজনাবদ্ধ নকশা বানাই, তখন আমরা সেটা দেখে হয়রান হয়ে যাই! কারণ সেই নকশা ডিএনএ এর অণুর স্থানিক সংরচনার নকশা ছিল।"

কৈলাস পাহার আর তাঁর আশেপাশের পরিবেশের উপর গবেষণা করা বৈজ্ঞানিক নিকোলাই রোমনভ আর ওনার টিম তিব্বতের মন্দিরের ধর্মগুরুদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উনি বলেন, কৈলাস পর্বতের চারিদিকে একটি অলৌকিক শক্তি বয়ে চলে। এইসব কারণেই হয়তো আজও কৈলাস জয় করা কারোর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

টুইন টাউন, কেরালা

~ "টুইন টাউন কোদিনহিতে আপনাকে স্বাগতম।"

গ্রামে ঢোকার পথেই সাইনবোর্ডে ঠিক এই লেখাটিই চোখে পড়বে। গ্রামটির অবস্থান ভারতের কেরালা রাজ্যের মালাপ্পুরম জেলায়।

আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশাল দেশ ভারতে বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। ভারতের এই বৈচিত্র্যের বিশেষ এক স্থান দখল করে নিয়েছে কেরালার কোদিনহি গ্রাম, বিশ্বজুড়ে যার পরিচিতি 'টুইন ভিলেজ' বা 'যমজ গ্রাম' নামে।

জেলা সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে প্রায় বিচ্ছিন্ন এক গ্রাম কোদিনহি। গ্রামের তিন পাশেই পানি। মাত্র একদিকে ভূমি, যেখান দিয়ে নিকটবর্তী শহরগুলির সাথে গ্রামের মানুষের যোগাযোগ।

এই গ্রামে সবমিলিয়ে দুই হাজারের কিছু বেশি পরিবারের বসবাস, জনসংখ্যার মোট হিসেবে অঙ্কে ১১ হাজারের মতো, যাদের ৮৫ ভাগই সুন্নি মুসলিম।তবে এই গ্রামের অবাক করা তথ্য হলো, মাত্র দুই হাজার পরিবারের মধ্যে যমজের সংখ্যা ৪৫০ জোড়া, যা বৈশ্বিক গড়ের আট গুণের কাছাকাছি।

তবে কোদিনহি গ্রামে যমজ সন্তান জন্মের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০-৭০ বছর আগে থেকে। প্রথম যমজ সন্তান জন্ম হয় ১৯৪৯ সালে। বর্তমানে এই গ্রামে যমজ সন্তান জন্মের হার আগের চেয়েও বেড়েছে।

২০০৮ সালে এক হিসাব অনুযায়ী, কোদিনহি গ্রামে ২৬৪ জোড়া যমজ ভাই-বোন ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা বেড়ে ৪৫০ জোড়ায় ঠেকেছে। এই সংখ্যা অবশ্য পুরোপুরি সঠিক নয়। পদ্ধতিগতভাবে গণনা করলে সংখ্যা আরো

বাড়তে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, এই গ্রামে প্রকৃতভাবে পাঁচ শতাধিক যমজ ভাইবোন রয়েছে।

কিন্তু এর রহস্যের কোনো কূল-কিনারা হয়নি।

কোদিনহি গ্রামে প্রতি বছরই গড়ে ১৫ জোড়া যমজ সন্তানের জন্ম হয়। স্কুল থেকে শুরু করে পাড়ার মাঠ, সবখানেই একই দেখতে মুখের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে এ নিয়ে বিড়ম্বনাতেও পড়তে হয় অনেকের। বিশেষ করে গ্রামের মাঠে ফুটবল খেলার সময়। যমজ ভাইদের সব সময় একই দলে রাখা হয়। কারণ দুই ভাই দুই দলে খেললে অন্যরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অনেক সময়ে এদের গুলিয়ে ফেলেন।

কোদিনহি গ্রামের যমজ সন্তানের কথা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে জেনেটিক বিশেষজ্ঞরা এর রহস্য উদঘাটনের সিদ্ধান্ত নেন। হায়দরাবাদের সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি, কোচির কেরালা ইউনিভার্সিটি অব ফিশারিজ অ্যান্ড ওশানিক স্টাডিজ, জার্মানির টিউবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের মোট ১২ জনের এক বিশেষজ্ঞ দল কোদিনহি গ্রামের যমজদের উপর গবেষণা চালান।

বিশেষজ্ঞরা সেখানকার যমজ শিশুদের জিন স্ক্রিনিং করার পাশাপাশি তাদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। সেই সাথে কোদিনহি গ্রামের মাটি, বাতাস ও খাবার থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। অনেকের মতে, কোদিনহির জলে উপস্থিত একপ্রকার রাসায়নিক এই ঘটনা ঘটায়, আবার অনেকে কোদিনহির খাদ্যকে দায়ী করেছেন, কিন্তু কেরালার অন্যত্র এলাকার আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে কোদিনহির কোনো তফাৎ নেই। কিছু গবেষক বলেছেন, এখানে Tapioca নামক একটি গাছে উপস্থিত পদার্থ এর পিছনে দায়ী। দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত তথ্যই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। নাইজেরিয়ার ইগবো-ওরাও গ্রামেও যমজ শিশুদের জন্মহার বেশী, ওখানকার ইয়ামস্ নামক একটি খাদ্য তার জন্য দায়ী (GTH উৎপাদন বৃদ্ধি করে এই খাদ্য)। কিন্তু

কেরালার মানুষেরা এরূপ কোনো খাদ্য খায় না। সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার, বাইরে থেকে যেসব ব্যক্তিরা এখানে বসবাস স্থাপন করেছে কিংবা যারা এলাকা ছেড়ে বাইরে চলে গেছে তারাও যমজ শিশুদের জন্ম দিয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ এর পেছনের কারণ হিসেবে জিনকে দায়ী করেছেন। কিন্তু তারা কোনো জেনেটিক প্রমাণ দিতে পারেননি।ফলে তা এখনো রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছে।

বৃন্দাবনের নিধিবন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি যে রহস্যময় হবে, আর আশ্চর্য কি! বৃন্দাবনে যাওয়া ভক্ত ও পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ নিধিবন মন্দির। বৃন্দাবনের আক্ষরিক অর্থ বৃন্দা বা তুলসী বন। আর বৃন্দাবনের এই অসাধারণ সুন্দর মন্দির বাঁকে বিহারী মন্দির, যেখানে গেলেই চোখ টানবে মন্দিরের ভিতরে অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্যে ভরা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। এই মন্দিরটি নিধিবন নামক ঘন অরণ্য আবৃত। নিধি অর্থে সম্পদ এবং চারপাশে জঙ্গল ঘেরা বলে বন। সেখান থেকেই এই অঞ্চলের নাম নিধিবন। এই নিধিবনে রাত্রিবেলায় এমন কিছু ঘটে বিজ্ঞান আজও যার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। সন্ধ্যা আরতির পর এই মন্দিরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাত্রে নাকি বনভূমিতে অবতীর্ণ হন শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা। স্থানীয় লোকজনের মতে শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানানোর জন্য বনভূমি আলোকিত হয়ে ওঠে ,এবং এই সময় তিনি গোপিনীদের সাথে রাসলীলা মাতেন। তারা রাত্রে এই বনভূমিতে থেকে ভেসে আসা নুপুরের শব্দ শুনেছেন কিন্তু স্বচক্ষে কেউ দেখেছেন কি রাধাকৃষ্ণের সেই লীলা ? না, সম্ভব হয়নি কারণ মন্দির কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী সূর্যাস্তের পর কাউকে এই চত্বরে থাকতে দেওয়া হয় না। কেউ কেউ নাকি এই নির্দেশ অমান্য করে মহারাসলীলা প্রত্যক্ষ করবেন বলে লুকিয়ে রাত্রে থেকে গিয়েছিলেন এখানে, পরের দিন সকালে সেইসব মানুষকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে অথবা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছেন।

সন্ধ্যার পুজোর পর মন্দিরের সামনে কিছু খাবার, লাড্ডু ,শাড়ি ,পান পাতা দেওয়া হয়। তারপর বন্ধ করে দেওয়া মনে হয় মন্দিরের দরজা। নিধিবনের এই মন্দিরের দরজা বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয় মোট আটটি তালা। পরদিন সকালে দরজা খুলে দেখা যায় সেই খাবার অর্ধেক খাওয়া, পান চিবানো

এবং অন্যান্য সামগ্রী গুলি সব ব্যবহার করা। ভক্তদের মতে প্রতি রাতে শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর সাথে এই মন্দিরে বিশ্রাম করতে আসেন। তাই সন্ধ্যার পূর্বেই এখানে চন্দনের ঘট, জলপাত্র সহ জিনিসপত্র রেখে দেওয়া হয় ।

নিধিবন অরন্যের গাছগুলির এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গাছগুলির কান্ড ফাঁপা এবং ডালপালাগুলো নিচের দিকে নামানো। স্থানীয়রা বলে থাকে এই গাছগুলো আসলে ছদ্মবেশি গোপিনী। ভক্তদের বিশ্বাস তাদের ভক্তি ও ভালোবাসার টানেই রাধাকৃষ্ণ বাধ্য হন প্রতিরাতে এই বনভূমিতে ফিরতে ।বিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই অঞ্চলের রহস্যময় প্রভাবকে তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সবমিলিয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে মনে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে বৃন্দাবনের এই মন্দির।

এলিয়েন ঘাঁটি, কাংলা পাস

ভূতের গল্প অনেকে বিশ্বাস করেন আবার অনেকে অবিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু এলিয়েন?

পৃথিবীর অন্যতম দুর্গম স্থান 'Kong LA Pass' । এটি ভারত ও চীনের বিরোধপূর্ণ সীমান্তে অবস্থিত, এবং বর্তমানে এটা নোমেন্স ল্যান্ড হিসাবে পরিচিত হয়। স্থানীয়রা অনেকেই এখানে ত্রিকোণাকার একপ্রকার জাহাজ নামতে দেখেছেন, আবার অনেকে সজোরে আকাশে মিলিয়ে যেতেও দেখেছেন। দুই দেশ প্রথমে মনে করে ছিল এটা অপর দেশের গোপন চক্রান্ত। কিন্তু ২০০৬ সালে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তোলা একটি চিত্রে স্পষ্ট UFO জাতীয় বস্তু ধরা পড়ে। কাংলার পশ্চিম দিক দিয়ে যাবার সময়ে একদা একদল হিন্দু তীর্থযাত্রী আকাশে আগুনের গোলা উড়তে দেখেন। ২০১২ সালে Indo Tibetan Border Force রিপোর্ট করেন আগস্ট থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নাকি ১০০টির মত UFO ওই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া গেছে। আহমেদাবাদের Space Application Center থেকে Dr. Anil Kulkarni ২০০৪ সালে এই ব্যাপারটার উপর পর্যবেক্ষণ চালান। ওনার দল ওখানে এলিয়েনের মতো দেখতে এক অদ্ভূত জীব দেখতে পান। ওই দৃশ্যকে ফ্রেমবন্দি করার চেষ্টা করেন তারা। সঙ্গে সঙ্গে সেই জীব অদৃশ্য হয়ে যায়। এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটতে থাকায় লাদাখের কাংলা পাস বর্তমানে এলিয়েনদের স্থান নামে পরিচিত। যদিও দুই দেশ এ সম্পর্কে এখনও নীরব।

সঙ্গীত স্তম্ভ, হাম্পি

উত্তর কর্নাটকে স্থিত একটি ছোট শহর হাম্পি এক সময়ে বিজয়নগর সম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ আসন ছিল। এটি একটি সমৃদ্ধ এবং ধনী রাজ্যের সাক্ষ্য বহন করে যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন আক্রমণকারী দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। কেউ এর আগ্নেয় শিলার অনমনীয় সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হয় তো কেউ আধুনিক ভারতের ব্যস্ততার মাঝে এক অন্য সময় কে অনুভব করেন।

হাম্পি প্রাচীন বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা বেষ্টিত। এখানে ১৪ শতাব্দীর স্মারকসমূহের ভাস্কর্য পাওয়া যায় যা খুবই জনপ্রিয়। এর জটিল ভাস্কর্য নিপতিত রাজা এবং রাণী, প্রজা এবং কৃষক যারা এই রাজ্যের অংশ ছিলেন এবং এখানকার স্ত্রী পুরুষ এবং তাদের ভালবাসা 'দেবদাসী'দের গল্প বলে।

হাম্পি তে ৫০০র বেশি ঐতিহাসিক কাঠামো আছে যা সকলকে মোহিত করে।

এখানের অন্যতম আকর্ষণ ভিত্তিলা টেম্পেল কমপ্লেক্স যেখানে পিলারের গায়ে টোকা মারলে সুর নির্গত হয়। ১৬ শতাব্দী তে তৈরী এই মন্দিরের চিত্তাকর্ষক স্তম্ভ হল পাথরের রথ। এই হলের মূর্তি তৈরী হয়েছে বিশাল গ্রানাইট স্তম্ভ খোদাই করে। এখানেই রয়েছে সঙ্গীত স্তম্ভ যার থেকে সঙ্গীত নির্গত হয় যখন তাকে টোকা দেওয়া হয়।

এছাড়াও এখানে রয়েছে হাম্পির সব থেকে পুরনো বিরূপাক্ষ মন্দির, বরাহ মন্দির, হাজারা রাম মন্দির কমপ্লেক্স, অভিজাত বাসগৃহসমূহ, রানীর স্নানাগার, পদ্মমহল প্রভৃতি অনেক জায়গা যা পর্যটকদের আকর্ষণীয়। UNESCO থেকে ১৯৮৬ সালে হাম্পিকে World Heritage Site ঘোষণা করা হয়। এককথায় এখানে আধ্যাত্মিক অতীত হয়ে ওঠে জীবন্ত।

রামোজি ফিল্ম সিটি

বিশ্বের নাম করা ফিল্ম সিটি গুলোর মধ্যে অন্যতম ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত "Ramaji Flim City"। ভারতবর্ষের যেসব স্থানে ভৌতিক আনাগোনার কথা শোনা যায় তার মধ্যে এটি অন্যতম। ১৯৯৬ সালে রামজি রাও-এর নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে এই ফিল্ম সিটি নির্মাণ করা হয় যার আয়তন ১৬৬৬ একর বা ৬ বর্গকিলোমিটারের বেশি।

বর্তমানে এটি আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বহত্তম ফিল্ম সিটি। এখনো পর্যন্ত এই

ফিল্ম সিটিতে প্রায় ১২০০ -র বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এখানে হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলেগু, কন্নর ভাষায় চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে এবং বহু বিদেশি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্রে আমরা কলকাতার গলি, চেন্নাই-এর মহল্লা, পুরানো বাজার বা মুম্বাই-এর যে বস্তি দেখে থাকি তা আসলে এই ফিল্ম সিটিতেই সেট ফেলে বানানো হয়।

মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ এলাকাটি বিশেষ করে রাতেরবেলা যখন উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়। তখন উন্মোচিত হয় "RAMOJI FILM CITY " -র অপার্থিব সৌন্দর্য। কিন্তু এই আলোর আড়ালে রয়েছে অন্ধকার। শোনা যায় নির্মাণের পর থেকেই নানান ভৌতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এই স্থান কুখ্যাতি পেয়ে আসছে।

গোটা অঞ্চল জুড়ে কেমন যেন একটা supernatural activity অনুভব করে এখানে আসা অনেক মানুষ। তবে সবচেয়ে বেশি রহস্যময় কর্মকাণ্ডের কথা শোনা যায় ফিল্ম সিটির অন্তর্গত সীতারা হোটেলটি ঘিরে। এই হোটেলের প্রত্যেক কক্ষে বারান্দায়, লিভিং রুমে বা ড্রেসিং রুমে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অতৃপ্ত আত্মাদের উপস্থিতির নানা কাহিনী। আচমকা কোনো এক শব্দ, বাতাসের অস্বাভাবিক গতিবিধি, আলো নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় নিজে থেকেই জ্বলে ওঠা, টেবিলে সাজিয়ে রাখা খাবার

ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা —এইসব প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। ফিল্ম সিটিতে কর্মরত বেশ কিছু লোকজন রহস্যজনকভাবে ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়েছে বলেও শোনা গেছে। সীতারা হোটেলের প্রত্যেকটি রুমে, বারান্দায় এবং অন্যত্র ছড়িয়ে রয়েছে একটা আলাদা রোমাঞ্চ, কয়েক মুহূর্ত একা থাকলে যা গায়ে কাঁটা দিতে বাধ্য করে। শুধু সীতারা হোটেলই নয়, রামোজি ফিল্ম সিটির বহু হোটেলে এরূপ কার্যকলাপ ঘটে। ইতিহাস বলছে, এই ফিল্ম সিটি যে স্থানটিতে তৈরি হয়েছে তা মূলতঃ মহাবীর নিজামের যুদ্ধক্ষেত্র অনাজপুর। এই স্থানে বেশ কয়েকবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং প্রতিটি যুদ্ধে শত শত সৈনিক মৃত্যুবরণ করেছে। সেই মৃত সৈনিকদের অতৃপ্ত আত্মা পরিবেষ্ঠিত এই জায়গায় রাত বাড়লেই এরূপ উপদ্রব বাড়তে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল এখানে বেশিরভাগ সময়ে মহিলারাই ভৌতিক অভিজ্ঞতার স্বীকার হন। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে এধরণের অভিজ্ঞতা একেবারেই যে হয়নি তা নয়। ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ বেশি থাকার দরুন এই ফিল্ম সিটির বহু স্থানে আজও প্রবেশ নিষেধ। রামোজি ফিল্ম সিটিতে যে সকল স্ট্যান্টম্যানেরা কাজ করেছেন তারাও বিভিন্ন অদ্ভূত অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন। একজন সিনিয়র স্ট্যান্টম্যানের মতে সেখানে কিছু নেগেটিভ শক্তি মানুষের ক্ষতি করতে চায়। শুটিং চলাকালীন তিনি দুবার খারাপভাবে আহত হয়েছিলেন। এখানে লাইটম্যান ও পাহারাদারেরাও আহত হয়েছেন বহুবার। প্রযুক্তিবিদরা ঝুলন্ত আলোগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করে যত্নসহকারে ব্যবহার করে থাকেন, তবুও আলোগুলি বারবার সিলিং থেকে পড়ে যায়। সর্বোপরি সাজঘরের আয়নাগুলির উপর অদ্ভূত চিহ্ন, খাবার বিক্ষিপ্তভাবে যত্রতত্র ছড়িয়ে যাওয়া, ড্রেসিংরুমে পোশাক আপনা থেকেই ছিঁড়ে যাওয়া, কোনো প্রাণীর আঁচোরের দাগ —এইসব কোনো অন্ধকার দিককেই ইঙ্গিত করে। ভারতের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রায়শই প্রকাশিত হয় হায়দ্রাবাদের Ramoji Film City-তে ঘটতে থাকা বিভিন্ন রকমের ভৌতিক কাহিনী। এইসবের পড়েও আজও এখানে অনেক বড় বড় সিনেমার শুটিং চলে এবং বহু পর্যটকদের আগমন ঘটে। হায়দ্রাবাদের সবচেয়ে বিখ্যাত Ramoji Film City এইভাবেই যেনো আজ হয়ে উঠেছে এক ভৌতিক ফিল্ম সিটি।

ভানগড় দুর্গ, রাজস্থান

রাজস্থানের আলবর জেলায় অবস্থিত ভানগড় কেল্লা এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে ভীতিকর স্থানগুলোর একটি। সন্ধ্যা ৬টার পর কেল্লার ভেতরে কাউকে অবস্থান করতে দেওয়া হয় না- এটা রীতিমতো সরকারি আদেশ। তাই বিকাল সাড়ে ৫টা থেকেই কেল্লার ভেতর থেকে পর্যটকদের বের করে দেওয়া শুরু করে নিরাপত্তাকর্মীরা- যাতে ভুলেও কেউ নির্দিষ্ট সময়ের পর সেখানে রয়ে না যায়। বলা হয়, গভীর রাতে এই কেল্লায় নর্তকীদের প্রেতাত্মার নাচসহ নানান অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে যা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।

বিশ্বের সেরা দশটি হন্টেড স্থানের একটি হিসেবে ধরা হয় ভানগড় কেল্লাকে। জানা গেছে, বার দুয়েক কিছু দুঃসাহসী সেখানে রাতের অন্ধকারে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিণতি ভালো হয়নি তাদের। তেমনি দুই স্থানীয় দুঃসাহসী তরুণও সন্ধ্যা ঘনিয়ে যাওয়ার পর দুর্গের পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছিল। কিন্তু তারা আর ফিরেনি। মারা গেছে কিনা তাও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শুধু তাদের আর কোনোদিন দেখা যায়নি কোথাও।

এর বেশকাল পরে আরেকটি গ্রুপ যায় সেখানে। তিনজনের ওই দলটি ভূতের অভিজ্ঞতা নেবার জন্যে সন্ধ্যার পর আলো জালিয়ে ঢুকে যায় দুর্গে। তাদের মধ্যে একজন চাইলো পুরো রাতটা সেখানে কাটিয়ে দিতে। তার সঙ্গীরা নিষেধ করলো। কিন্তু অসম্ভব সাহসী লোকেরা কেমন হয় জানেনই তো। তিনি ভেতরে রইলেন আর তার অপেক্ষায় দূর্গের বাইরে গাড়িতে অবস্থান নিলেন তার বন্ধু ও গাড়ির ড্রাইভার।

পরদিন ভোর হলে কেল্লার ভেতরে বন্ধুকে খুঁজতে গিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাকে উদ্ধার করে যখন দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন গাড়িটি হঠাৎ দুর্ঘটনার শিকার হয়- মারা যায় দুই বন্ধুসহ গাড়ির ড্রাইভার। এরপর থেকে সেই 'অভিশপ্ত' কেল্লায় রাত কাটানো একেবারেই নিষেধ হয়ে

যায়। এভাবেই কেল্লাটির ভীতিকর গল্প ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। দিনদিন এর সঙ্গে যোগ হয় আরও কল্পিত অনেক কাহিনী।

এখনও পর্যটকরা ভানগড় গেলে সূর্যাস্তের আগেই ফিরতি পথ ধরেন। আর রাতে থাকতে হলে যেতে হয় কমপক্ষে ৫০ কিলোমিটার দূরের সিরিস্কায়, হোটেলে।

ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, একসময় ভানগড় এক সমৃদ্ধ নগর ছিল। এই নগরটি বিরান হয়ে যায় স্রেফ একজন তান্ত্রিকের অনাচারী অসৎ কাজের জন্য- লোকমুখে এ ধারণা প্রচলিত। ঐতিহাসিক তথ্য মতে- ১৫৭৩ সালে আম্বরের রাজা ভগবন্ত দাস তার কনিষ্ঠ পুত্র মাধো সিংহের জন্যে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার পরবর্তী প্রায় তিন পুরুষ এই নগর শাসন-পরিচালন করে।

কথিত আছে, ভানগড়ের রাজকুমারী রত্নাবলী অসম্ভব সুন্দরী আর বুদ্ধিমতি ছিলেন। সিন্ধিয়া নামের এক তান্ত্রিক রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। কালোজাদুতে সিদ্ধহস্ত তান্ত্রিক চাইলো রত্নাবলীকে নিজের করে পেতে। কিন্তু তার পক্ষে তো রাজকুমারীকে বিয়ে করা সম্ভব নয়! অসম্ভবকে সম্ভব করতে সে ফন্দি আঁটতে থাকে। একদিন রাজকুমারী রত্নাবলীর দাসী যখন রাজকুমারীর জন্য বিশেষ ধরনের সুগন্ধি তেল আনতে যাচ্ছিল তখন সিন্ধিয়া দাসীকে কায়দা করে মন্ত্রপড়া তেল দিয়ে দেয়। ওই তেলের প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে রাজকুমারী তার কাছে চলে আসবে- কুটিল জাদুকর এমনটাই ফাঁদ পেতেছিল। কিন্তু দাসী যখন তেলের শিশি নিয়ে প্রাসাদে ফিরছিল তখন হঠাৎ তার হাত থেকে তা একটি বিশাল পাথরের ওপর পড়ে ভেঙে যায়। ভাঙা শিশির তেল গড়িয়ে পড়ে পাথরে। এরপর যাদুই তেলের আবেশে ওই পাথরটি তান্ত্রিকের দিকে চলতে শুরু করে। জাদুমন্ত্রতাড়িত পাথরটি চলতে চলতে একপর্যায়ে তান্ত্রিকের ওপর চেপে বসে এবং নির্মমভাবে তার মৃত্যু হয়। কেউ কেউ অবশ্য দাবি করেন, রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই গিয়েছিলেন সুগন্ধি তেল সংগ্রহে। এসময় তিনি তেল নিয়ে যাদুকরের মতলব বুঝে ফেলেন। তাই তিনিই সেই তেলের শিশিটি একটি বড়সর পাথরে আছার দিয়ে ভেঙে ফেলেন।

অপরদিকে, নিজের অপকর্ম বুমেরাং হয়ে তার নিজেকেই নির্মম মৃত্যুর স্বাদ দেওয়ার মুহূর্তেই প্রতিশোধ নিতে মরিয়া তান্ত্রিক সিন্ধিয়া ভানগড় নগরকে বিনাশ করে ফেলার কায়দা করে ফেলে । কথিত আছে, তান্ত্রিকের মৃত্যুর পরের দিনের সূর্য ওই নগরের কেউ আর দেখেনি- রাজকুমারী রত্নাবলীসহ নগরের সবাই এক রাতেই শেষ হয়ে যায়। ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছিল- তা নিয়ে নানা জনের নানা বয়ান রয়েছে।

এমন একটি বয়ান হচ্ছে, ভানগড় একরাতে শেষ হয়নি। মৃত্যুর আগে সিন্ধিয়া রাজকুমারীকে বলে যায়, রাজপরিবারের কাউকে সে বাঁচতে দেবে না। আর খোদ রত্নাবলীকে সে মরার পরেও ছাড়বে না। এর কিছুদিন পর প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে ভানগড়ের ভীষণ যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে রাজপরিবারসহ গোটা ভানগর ধ্বংস হয়ে যায়। স্থানীয়দের বিশ্বাস ওই কেল্লায় নাকি তান্ত্রিক ও রত্নাবতীর অতৃপ্ত আত্মা এখনও ঘুরে বেরায়।

রাজকুমারী রত্নাবলীর ঘটনা ছাড়াও আরেকটি ঘটনাকেও ভানগড় ধ্বংস হওয়ার পেছনের কারণ বলে মনে করেন অনেকে। তাদের মতে, রাজা ভগবন্ত দাসের পুত্র মাধো সিংহের (ছত্র সিংহের বাবা। তার সময়েই ধ্বংস তথা বিলীন হয়ে যায় ভানগড়) জন্য কেল্লা তৈরি হচ্ছিল তখন বাধা দেন গুরু বালুনাথ নামের এক ক্ষমতাধর সাধু। কেল্লার পরিকল্পিত চত্বরের এককোণে বালুনাথের আশ্রম ছিল। বালুনাথ মাধোকে বলেছিলেন, কেল্লাতে তার আপত্তি নেই। তবে এর ছায়া যেন তার আশ্রমের ওপর না পড়ে। তেমন হলে তিনি কেল্লা ধ্বংস করে দেবেন। এই হুমকি দিয়েই কিন্তু বালু ক্ষান্ত হননি। রাজবংশের সবাইকে বিনাশ করার চূড়ান্ত ঘোষণাও দিয়েছিলেন তিনি।

সাধুর কথায় গুরুত্ব দিয়ে মাধো কথা দিয়েছিলেন, কেল্লা সেভাবেই নির্মিত হবে। কিন্তু কেল্লা দাঁড় করানোর পর দেখা গেল, দিনের কিছু সময়ের জন্য হলেও কেল্লার ছায়া বালুনাথের আশ্রমকে ঢেকে দিচ্ছে। তখন ক্ষুব্ধ বালুনাথ

কেল্লার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ভানগর রাজ্য ধ্বংস করে দিলেন। এলাকাবাসীর মতে এই কারণেই নাকি ওই এলাকায় কোনও ঘর নির্মাণ করলে তার ছাদ ধ্বসে পড়ে।

ভানগড় কেল্লার দরজার উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। ঢুকলেই সামনে বাগান। বাগানে ফুলের সুবাস থাকে সব সময়। প্রচণ্ড খরায়ও বাগানে কোনো ফুল নাকি শুকিয়ে যায় না- এমিন বিশ্বাস স্থানীয়দের। বাগান পেরিয়ে সামনে এগুলেই জলাধার দেখতে পাবেন। স্থানীয় ভাষায় একে 'বাউলি' বলে। বাউলির এই অংশ থেকেই অনেকে নূপুরের আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন।

এখনকার দিনে ভানগড় নগরে আপনি প্রবেশ করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে নগরের একসময়কার জমজমাট বাজারটির বিরান রূপ। রাস্তার পাশের দোকানগুলোর দেওয়াল এখনও দাঁড়ানো আছে কিন্তু তাদের ছাদগুলো ধসে পড়া। দেখে মনেই হয় না কখনো সেখানে ছাদ জাতীয় কিছু ছিল। সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে ধারণা হবে- কেউ ধারালো তলোয়ার দিয়ে ওইসব ঘরের ছাদগুলো কেটে ফেলে দিয়েছে অথবা দোকান ঘরগুলো বানানোই হয়েছে এমন কায়দায়। অনেকেই বলেন, নগরের একসময়কার জমজমাট নাচমহল (নর্তকী মহল) থেকে এখনও রাতে ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়।

কিন্তু তারপরও কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, সেখানে কি সত্যিই কোনো ভূত বা অশরীরির দল আস্তান গেড়ে আছে? এই প্রশ্নের মীমাংসায় সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার নিয়ে কাজ করেন- এমন একদল প্যারানরমাল ইনভেস্টিগেটর সেখানে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সেখানে নেগেটিভ অ্যানার্জির উপস্থিতির কথা স্বীকার করেছেন। কিছু কিছু তদন্তকারীর ক্যামেরায় অদ্ভূত অদ্ভূত সব বস্তুর ছবিও ধরা পড়েছে বলে দাবি করা হয়- কিন্তু কেউ এমন দাবি করেননি যে এগুলোই ভূত বা ভূতের ছবি। তাদের মতে, গবেষণা এখনও চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এমন কিছু বলা যাবে না।

কেউ প্রশ্ন করছেন, ভূত যদি নাই হবে তবে সেখানে নেগেটিভ অ্যানার্জির উপস্থিতি কেন? আর অনেকেই জানতে চাইতে পারেন যে নেগেটিভ অ্যানার্জি বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? এ প্রসঙ্গে কিছু প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটরের ব্যাখ্যা হচ্ছে- এমন শক্তি যা দীর্ঘকাল ধরে একই স্থানে আটকে আছে এবং কোনো কারণে যার স্বাভাবিক চলাচল থমকে আছে, এমন কিছুকে নেগেটিভ অ্যানার্জি বলা হয়।

প্যারানরমাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার প্রধান গোবিন্দ কুমার এ প্রসঙ্গে বলেন, যে কোনো স্থান যা ৪০ দিনের চেয়ে বেশি বন্ধ থাকে সেখানে নেতিবাচক শক্তি এসে আবাস গাড়ে। ভানগড়ের কেল্লা তো বছরে পর বছর বিরান থেকেছে। এমন অবস্থায় সেখানে নেতিবাচক শক্তির অনুভব হওয়া স্বাভাবিক।

শেষ করার আগে আরেকটি কথা। এখান থেকে শুধু সূর্যাস্তের আগে পর্যটকদের বের করে দিয়েই কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব শেষ করেনি বরং স্থানটিকে ঘিরে ভীতিকর কাহিনী এতই কঠিন শেকড় গেড়েছে যে সূর্যাস্তের পর আর সূর্যোদয়ের আগে এখানে প্রবেশ একেবারেই নিষেধ করে দিয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ।

টানেল নং ৩৩

ভারতের হিমাচল প্রদেশের অন্যতম বিখ্যাত রেলওয়ে হল কালকা সিমলা রেলওয়ে। ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকার অন্তর্গত এই রেলওয়ে জুড়ে রয়েছে ১০২ টি টানেল। প্রকৃতির কোনো ক্ষতি না করে, তার সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রেখেই যে উন্নয়ন সম্ভব তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়াররা। চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে ঝলমল করছে পাহাড়ি ফুল, সবুজ ঘাস তার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন। এই হেরিটেজ রেলওয়ে একটি অংশ বায়োগ্যাস টানেল। কালকা সিমলার সবচেয়ে বড় লম্বা এই টানেলের দৈর্ঘ্য ১.১৪ কিলোমিটার শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সবথেকে সোজা টানেল এটি। ঘন্টায় ২৫ কিলোমিটার বেগে অতিক্রম করতে লাগে প্রায় আড়াই মিনিট সময় নেয়। টানেল নাম্বার ৩৩ নামেও পরিচিত এটি। আর এই সুড়ঙ্গের ঘনকালো অন্ধকার টেনে নিয়ে যেতে পারে অলৌকিক দুনিয়ায়। সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যখন টয় ট্রেন যায় তখন অজানা গলার আওয়াজ অনেক সময় শুনতে পাওয়া যায় বলে শোনা গেছে। নিকটে

বাস করা বহু লোকের মুখে শোনা যায় যে তারা একজন ব্যক্তিকে আলখেল্লা ও টুপি পড়ে এখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন। যারাই এই টানেলটিতে হেঁটে ঢুকেছেন, তারাই অল্পবিস্তর অস্বাভাবিকতা অনুভব করেছেন। টানেল টির ভিতরে দেওয়ালগুলো স্যাঁতস্যাঁতে এবং ভিতরে অদ্ভুতভাবে টুপটুপ করে জল পড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়। মনে করা হয় ৩৩ নম্বর টানেলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একজন ব্যর্থ ইঞ্জিনিয়ারের কাহিনী। টানেল তৈরীর মূল তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল বারোগ। তিনি তার কর্মীদের দু'ভাগে ভাগ করে দুদিক থেকে পাথর কাটতে বলেছিলেন। অঙ্ক কষে, বিস্তার হিসাব করে জায়গা বেছে ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এইভাবে দু দিক থেকে খুঁড়তে থাকলে মাঝখানে এসে জুড়ে যাবে ব্যাপারটা। তৈরি হয়ে যাবে সুরঙ্গ। কিন্তু সামান্য ভুলের কারণে রাস্তা এক জায়গায় এসে মিলল না। খবরটা ব্রিটিশ সরকারের কানে পৌঁছাতেই ১ টাকা জরিমানা হল এবং তার বদলে অন্য একজন ইঞ্জিনিয়ারকে নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হলো। মানসিক অবসাদগ্রস্ত বারোগ সাহেব তার পোষা কুকুরকে নিয়ে হাঁটতে বেরোলেন এবং টানেলের কাছে এসেই পকেট থেকে রিভলবার বের করে আত্মহত্যা করলেন। এই অপমানের দায় নিয়ে আর বাঁচতে চাননি তিনি। তবে কার্নেল বারোগকে স্মরণে রাখতে স্টেশন চত্বর এবং এই টানেলের নামের সাথে যুক্ত করা হয় তার নামে তার নাম এবং তার দেহ সমাধিত করা হয়। ১৯৩০ সালে টানেল নম্বর ৩৩ এর কাজ শেষ করেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এস হ্যারিংটন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস টানেলের মায়া এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি বারোগ সাহেব। টানেলের ভেতর একটু ঢোকার পরেই গভীর অন্ধকার চেপে। বছর দুয়েক আগে একজন ব্যক্তি হেঁটে টানেলটি পার করছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল ফটো তোলা। টানেলের প্রায় মাঝামাঝি এসে তিনি যখন ক্যামেরায় চোখ রাখলেন হঠাৎই চারপাশ থেকে এলোমেলোভাবে তিব্র ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে দেয়। কল থেকে জল পড়ার মতো শব্দ তিনি শুনতে পান এবং চারপাশের নিস্তব্ধ পরিবেশ যেন আরও শান্ত হয়ে যায় ,তিনি আরও একজনের উপস্থিতি অনুভব করেন এবং নানা রকম অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পান। আতঙ্কিত অবস্থায় দৌড়ে টানেল থেকে বেরিয়ে আসেন ভদ্রলোক। এরপরেও যারা টানেলের ভিতর প্রবেশ করেছেন তারাও এরূপ অভিজ্ঞতার

সম্মুখীন হয়েছেন। এটির মুখে একবার তালা দেবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু গেটের তালাটি ভেঙে যায় । তবে অতৃপ্ত আত্মা, কারোর কোনো ক্ষতি করেনি। এমনই নানা ঘটনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এই টানেল জুড়ে।

ডাও হিল ফরেস্ট

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কারশিয়াং–এর ডাও হিল স্টেশন। পাহাড়ের কোলে এই এলাকায় রয়েছে মন মাতানো প্রাকৃতিক রূপ। এই হিল স্টেশনেই 'Victoria Boys' স্কুল সংলগ্ন ডাও হিল

ফরেস্ট হল এমনই একটা জায়গা যেখানকার গা ছমছমে কিছু রহস্যময় ঘটনা গোটা এলাকাকে কুয়াশার মতো করেই আগলে রাখে। স্থানীয় লোকের মুখে শোনা যায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার পরেও শিশুদের খেলা-ধুলার আওয়াজ এবং তাদের চিৎকার ভেসে আসে , প্রায়ই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এর ঠিক লাগোয়া স্কুল এর পিছনেই অবস্থিত ডাও হিল ফরেস্ট। অর্কিডের প্রাচুর্যের জন্য এই জায়গাকে 'Land of Orchids' – বলা হয়ে থাকে।জঙ্গলের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে যায় ফরেস্ট অফিস পর্যন্ত। এই রাস্তাকে বলা হয় 'Death Road' । এই রাস্তাতে দেখা যায় মস্তকহীন দেহ বা Headless Spirit । এখানে সন্ধ্যার দিকে কাঠ সংগ্রহ করতে আসা লোকেরা প্রায়ই দেখে থাকেন একটি বালক রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে যার শরীরটা আছে মাথা নেই।অনেকে এই মস্তকহীন দেহকে গাছে উঠতে

কিংবা স্কুল এর আশেপাশে ঘুরতে দেখেছেন। ডাও হিল ফরেস্টে এসে অনেক পর্যটক আত্মঘাতি হয়েছেন,অনেকে হারিয়ে গেছেন বলেও শোনা যায়। এখানে অনেক মার্ডারও হয়েছে এবং কিছু অস্বাভাবিক মৃত্যুও ঘটেছে । তাই স্থানীয়রা একে অভিশপ্ত জঙ্গলও বলে থাকেন। এই জঙ্গল এতটাই ঘন যে দিনের সূর্যলোকের প্রবেশও এখানে হয়ে ওঠে না। জঙ্গলে প্রবেশের সময় অনেকেরই মনে হয় তাদের যেন কেউ অনুসরন করছে, কেউ তাদের পেছন থেকে ডাকছে । জঙ্গলের ধারের এই রাস্তাতেই বহু মানুষ বিভিন্নরকমের গা ছমছমে অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন। এই রাস্তায় একজন ধুসর বেশী বৃদ্ধাকে দেখতে পাওয়া যায়। এই বৃদ্ধাকে যারা অনুসরণ করেছে তারা এই জঙ্গলে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। এছাড়াও জঙ্গল থেকে প্রায় দিনই আর্তনাদ ভেসে আসে। সন্ধ্যের পর স্থানীয়রা কেউই ওই অঞ্চলের ধারে কাছে যায় না। কারশিয়াং এর ডাও হিল ফরেস্ট কেবল স্থানীয়দের কাছেই নয়, ভারতবর্ষের সব থেকে গা ছমছমে ভৌতিক স্থান হিসাবে খ্যাতি পেয়েছে।

খইরাতাবাদ সাইয়েন্স কলেজ

হায়দ্রাবাদের খইরাতাবাদ ফ্লাইওভারের ঠিক সামনে একটি পুরোনো অসম্পূর্ণ বিল্ডিং রয়েছে যা একসময় একটি বিজ্ঞান কলেজ ছিল। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসতো এই কলেজে। Khairatabad Science College - নামে পরিচিত নামকরা এই কলেজটি একসময় কি কারণে বন্ধ হয়ে যায় তা জানা যায়নি। কলেজের উন্নত জীববিজ্ঞানের ল্যাবগুলিতে কিছু মৃতদেহ সংরক্ষিত করা ছিল। কলেজটি উঠে যাওয়ার সময় সেই দেহগুলি সঠিকভাবে ডিসপোজড করা হয়নি। সেই কারণেই নাকি বর্তমানে এই কলেজ ভৌতিক আকার নিয়েছে। যে সমস্ত লোকেরা রাতের বেলা কলেজের সামনে দিয়ে যান তারা ভিতর থেকে ভেসে আসা অদ্ভূত শব্দ শুনতে

পান। অনেকে বলে থাকেন, রাতে ওই কলেজের ভিতরে কেউ প্রবেশ করলে সে আর ফিরে আসে না। কঙ্কাল হেঁটে চলেছে কিংবা ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে এরূপ দৃশ্যও অনেকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

সারকার কর্তৃক সেখানে একজন পাহারাদারকে নিযুক্ত করা হয়ছিল। কলেজ এবং সংলগ্ন চত্ত্বরের দেখা শোনা করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। কিন্তু পরদিনেই সেই ব্যক্তি রহস্য জনক ভাবে মারা যান। এর পর থেকে রাতে ওই এলাকার সামনে দিয়ে যাতায়াত করা বন্ধ করে দেয় স্থানীয় মানুষেরা।

খেরতাবাদের অভিমুখে মাসব ট্যাঙ্ক চৌরাস্তার দিকে যাওয়ার সময় ধ্বংস স্তূপ হয়ে থাকা কলেজ বিল্ডিংটির চেহারা এবং তার অদ্ভূত নেগেটিভ আবহাওয়া যেকোনো ব্যক্তির মধ্যেই ক্ষণিক আতঙ্কের শিহরণ জাগিয়ে থাকে।

স্যভয় হোটেল, মুসৌরি

ঐতিহাসিক স্যভয় হোটেল উত্তরাখণ্ডের হিল স্টেশন মুসৌরিতে অবস্থিত। 1902 সালে অত্যন্ত বিলাসবহুল জনপ্রিয় এই হোটেলটি ডন উপত্যকার নিকটে 11 একর জমির উপর নির্মাণ করা হয়। এটি ইংরেজ আর্কিটেকচার দিয়ে গঠিত তাই এর বেশিরভাগ অংশ কাঠের তৈরি। ১৯০০ সালে মুসৌরিতে রেললাইন গঠিত হওয়ার জায়গাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনের সময় ইউরোপীয়রা এখানে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে আসতো । এই হোটেলটিকে রয়েছে অত্যন্ত বিখ্যাত একটি বার যা writers bar নামে পরিচিত। এক কথায় ঐ আমলে মুসৌরি স্থানটি ছিল বিনোদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এবং সেখানে স্যাভয় হোটেলটি ছিল একমাত্র রাত্রি যাপনের স্থান।

প্রচলিত কাহিনী অনুসারে 1910 সালে লখনৌ থেকে মিস ফ্রান্সিস গার্নেট ওর্ম ও মিস এভা মাউন্ট স্টিফেন নামে দুজন মহিলা কয়েক দিনের জন্য স্যাভয় হোটেলে আসেন। তার কয়েকদিন পর লেডি গার্নেট ওর্ম এর ওষুধে প্রাসিক অ্যাসিড (HCN) মিশিয়ে হত্যা করে তারই এক ডাক্তার। হোটেলের করিডরে সেই মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যায়। আশ্চর্যজনকভাবে কিছুদিন পর ওই ডাক্তার কে একই জায়গায় মৃত পাওয়া যায়। তারপর থেকে ওই হোটেলে রাত্রিবেলা প্রায় এক মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। এরপর থেকে স্যাভয় হোটেলকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভয়ানক ত্রাস।

আগাথা ক্রিস্টি রচিত বিখ্যাত উপন্যাস "The mysterious affair at styles" এবং Ruskin bond-এর "In a Crystal Ball - a Mussoorie Mistry"

এই ঘটনা অবলম্বনে লেখা হয়। হোটেলে রাত্রিবাস অনেক অতিথিরা প্রায়ই এক মহিলার তীব্র চিৎকার করার অভিযোগ জানিয়েছেন। এমনকি রাতে অনেকে ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত ক্ষণস্থায়ী নারীমূর্তির মুখোমুখি হয়েছেন। হোটেল স্যাভয়কে ঘিরে বহু কাহিনী দূরদূরান্ত পর্যন্ত প্রসারের ফলে, সুন্দর সজ্জিত বড় বড় ঘর, নরম বিছানা বড় বাথরুম সহ ৫০ টি কামরা বিশিষ্ট বিলাসবহুল জনপ্রিয় হটেলটিতে লোকের আসা-যাওয়া অনেক কমতে থাকে। 2000 সালের পর হোটেলটি আবার কিছুটা চলতে থাকে। 2009 সালে Hotel control private limited ITC welcome group এই জায়গাটি কিনে নেয়। বর্তমানে হোটেলটি চলতে থাকলেও এই ঘটনার শিকার যে কেউ হয়নি তা নয়। এই হোটেলের অস্বাভাবিকতাকে কেন্দ্র করে আজও বহু অভিযোগ উঠে আসে।।

রহস্যময়ী তিলোত্তমা

প্রযুক্তির উন্নতির ফলে কলকাতা এখন সারা রাত ধরেই দিনের মত আলোকিত। তেনাদের আবার আলো সহ্য হয়না, তাই আজকের কলকাতার ভূতরা অনেকটাই বিপদগ্রস্ত। তবু আজও City of Joy - এর মাঝে রয়েছে বেশ কিছু স্বনামধন্য ভৌতিক জায়গা। সেই কুখ্যাত জায়গাগুলো একপলকে দেখে নেওয়া যাক।

~ কলকাতা যাদুঘর ~

কলকাতা শহুরে কর্তাদের যেসব কিংবদন্তি ছড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ভারতীয় জাদুঘর। ১৮১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নির্মিত প্রথম সংগ্রহশালা। বিচিত্র সব শব্দ আর উদ্ভট ঘটনার রাজ সাক্ষী জাদুঘর এবং তার আশপাশের এলাকা। মিউজিয়ামটি নিয়ে শহরবাসীর জল্পনাকল্পনার কমতি নেই। এ মিউজিয়ামের পাশের রাস্তাটি অর্থাৎ সদর স্ট্রিট আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে সেখানে থাকতেন ওয়্যারস্ট্রিংসের স্পিক সাহেব। এই স্পিক সাহেবের কাছ থেকেই শুরু হয়েছিল এক আশ্চর্য ঘটনার। এই রাস্তার উপরেই স্পিক সাহেবের কাছে এক বিশেষ আরজি নিয়ে এসেছিলেন এক শিখ যুবক। শিখ যুবকটি কৃতকার্য না হওয়ায় তিনি চড়াও হন সাহেবের ওপর। ঘটনা তখন তুঙ্গে, হঠাৎই শোনা গেল রাইফেলের তীব্র শব্দ। লুটিয়ে পড়ল যুবকের রক্তাক্ত দেহ। মধ্যরাতে এই স্মৃতি নাকি এখনো ফিরে আসে। শোনা যায় গুম গুম শব্দ। এখানেই শেষ নয়। আরও আছে, একবার জাদুঘরের

ছাদের স্কাইলাইট পরিষ্কার করতে গিয়ে দুটি শোকেসের মাঝে চাপাপড়ে মৃত্যু হয় এক মজুরের। গভীর রাতের অন্ধকারে কে যেন কাপড় মুড়ি দিয়ে আজও বেড়িয়ে যায়। কাঠের বাক্সে শুয়ে রাখা নিথর মমিতেও এমন কাহিনী কম নেই। এখনো নাকি মধ্যরাতে নর্তকীর নাচের শব্দ ভেসে ওঠে। কে বা কারা এসব ঘটনার সৃষ্টি করছে আজও সবার কাছে অজানা।

~ রাইটার্স বিল্ডিং ~

দিনের বেলায় সরকারি কাজের দরকারি দপ্তর। রাতে এখানেই শুন্য লবিতে কি সব নাকি হয়। সন্ধ্যার পর কেউ এই বাড়িটিতে থাকার সাহস দেখান না। যারা রাত কাটিয়েছেন, তাদের অনেকেই মাঝরাতে হঠাৎ কান্না, হাসি কিংবা চিৎকারের শব্দ শুনতে পেয়েছেন। নাইট গার্ডরা বলেন এখানের পাঁচ নম্বর ব্লক জায়গাটা নাকি সুবিধের নয়। বারান্দা দিয়ে কারা যেন হেটে বেড়ায়। শোনা যায় টাইপের শব্দ। মনে হয় খুব মনোযোগ দিয়ে কারা যেন কাজ করছেন। দোতলার সিড়িতে কারা যেন ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়। হঠাৎ করে কে যেন চিৎকার করে ওঠে। যদিও এসবের কোন সদুত্তর মেলাতে পারেনি কতৃপক্ষ।

তবে ইতিহাস বলে এখানেই এক সময় ছিল ভাং আর কলা গাছের জঙ্গল। একবার বেশ কয়েকজন ব্রিটিশকে এখানে কবর দেয়া হয়ছিল। লর্ড ভ্যালেন্টিনে লেখায় তথ্য মেলে দিল্লি থেকে আসা নব্য রাইটারদের মধ্যে ঘোড়ায় টানা গাড়ির খেলা কিংবা ডুয়েল চলতো। এতে করে সর্বদাই লেগে থাকতো খুন জখম। এমন বহু ঘটনার কথা আজও কলকাতাবাসীর মুখে মুখে। বিনয়, বাদল, দিনেশের হাতে কর্নেল সিমসনের ঘটনাও কি ফেলে দেয়া যায়! এসব ঘটনার আগে এখানে সরকারী কর্মীদের থাকতো। এরপর বহু দশক ধরেই ভবনটির বহু ঘর বন্ধ করে রাখা হয়েছিল।

~ জাতীয় গ্রন্থাগার ~

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি। বইয়ে ঠাসা লাইব্রেরিতে সন্ধ্যা নামলেই যার রূপ পালটে যায়। অন্ধকারে এর মাঠ পেরিয়ে নাকি ছুটে যায় অশ্বারোহী। বলডাস্কের ভিতর থেকে নাকি ভেসে আসে কনসার্টের করুণ সুর। শোনা যায় পালকির আওয়াজ। কে যায় কিংবা কার সুরেলা কণ্ঠে ভেসে আসে, কোনো সদুত্তর নেই। তবে ইতিহাসের কিছু ইঙ্গিত আছে। ১৭ আগস্ট ১৭৮০, সেদিন সকালে এখানে ডুয়েল শুরু হয় রয়্যাল হেস্টিংস আর ফিলিপ ফ্রান্সিসের। সেই গুলির লড়াইয়ের নেপথ্যে ছিলেন পরমা সুন্দরী ম্যাডাম গ্রান্ট। তাদের প্রণয়ের স্মৃতি নাকি আজও ফিরে ফিরে আসে লাইব্রেরি চত্বরে।

গুলিবিদ্ধ ফ্রান্সিসকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পালকিতে করে। আর হেস্টিংস বেলভেডিয়ার হাউসে আসতেন ঘোড়ায় চড়ে। তাহলে সে ইতিহাস কি কিছু বলতে চায়! এখনো সন্ধারাতে গা ছমছম করে লাইব্রেরির করিডর বরাবর হেঁটে গেলে। অনেকে নাকি সেই অশরীরী আত্মাদের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষও করেছেন। কেউবা শুনতে পান পায়ের আওয়াজ, কেউবা আবার ঘন ঠাণ্ডা শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুভূতি টের পান। অনেকেই বলেন, ঠিক জায়গায় বই রাখা না হলেই নাকি এমন ঘটনার সাক্ষী হতে হয়। রাতে লাইব্রেরির গার্ডরা বইয়ের পাতা ওল্টানোর আওয়াজও পান। ন্যাশনাল লাইব্রেরি ভূতের অস্তিত্ব কর্মচারী থেকে রাজনৈতিক নেতাদের মুখেই বারবার উঠে এসেছে।

~ হেস্টিং হাউস ~

আলিপুরের হেস্টিংস হাউসের অলৌকিকতা সম্পর্কে কম-বেশি সবারই জানা। এখানকার মানুষ বিশ্বাস করেন স্বয়ং হেস্টিংস এখানে আসেন। তখনকার পরাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বাড়িটি তৈরি করে এখানে থাকতেন। বর্তমানে এটি কলকাতা ইউনিভার্সিটির ওম্যান্স কলেজ। রাতে ঘটে যতসব অলৌকিকতা। ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে আসতে দেখা যায় কোনো এক ইংরেজকে। অনেকে বলেন

ওয়ারেন হেস্টিংসই নাকি ঘোড়ায় চড়ে আসেন। ঘরে ঢুকে ব্যস্ততার ছলে বিরক্তি নিয়ে ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন। আবার এমনও দেখা যায় ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যান। এই তো বেশ কিছুবছর আগের ঘটনা নতুন বছরের মধ্যরাতে হেস্টিংস হাউসে নিউ ইয়ার পার্টি চলে বলে শোনা যায়। একই রকমভাবে ফুটবল খেলতে আসা এক শিশুর মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া এখানে পাওয়া অপঘাতে মৃত্যুর লাশ। লাশগুলো ছিল কাটাছেঁড়া। আবার এ জায়গা সম্পর্কে শোনা যায়, অশরীরী আত্মারা সবচেয়ে বেশি এখানেই ঘোরাঘুরি করে।

~ রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব ~

ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় মুখরিত থাকে ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব খ্যাত রেসকোর্স ময়দানটি। দিনের আলোয় তেমন সমস্যা রাতে এখানে ঘটে যায় অলৌকিক সব ঘটনা। কে বা কারা যেন ঘোড়া নিয়ে ছুটে বেড়ান এখানে। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া ঘোড়া নিমিষেই বাতাসে মিলিয়ে যায়। এর সঠিক মতাদর্শ না পেলেও ইতিহাসে রয়েছে একটি কাহিনী। রয়্যাল পরিবারের ব্রিটিশরা এখানে ঘোড় সওয়ারী করতেন।

একবার এক ব্রিটিশ জর্জ উইলিয়ামস তার বিখ্যাত সাদা ঘোড়া নিয়ে ময়দান চষিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। অপরূপ সাদা ঘোড়াটির নাম ছিল প্রাইড। প্রচুর রেস আর ট্রফি জেতায়, প্রাইডকে তখনকার সময় এক নামেই চিনত। উইলিয়ামস ঘোড়াটিকে নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন। কিন্তু একবার অ্যানুয়াল টার্ফি টুর্নামেন্টের আগে আকস্মিকভাবেই প্রাইড অসুস্থ হয়ে পড়ে। উইলিয়ামস প্রাইডের প্রচুর যত্নআত্তি করেও লাভ হয়নি। যার ফলাফল তিনি অ্যানুয়াল ট্রফি হেরে যান। এরপরই একদিন সকালে জর্জ দেখে, খোলা ট্রাকের ওপরে মরে পড়ে আছে তার প্রিয় সাদা ঘোড়াটি। প্রাইডের শোক আর মায়ায় জর্জও বেশিদিন পৃথিবীতে ছিলেন না। কিন্তু এখনো প্রত্যেক শনিবার পূর্ণিমার রাতে দেখা যায় জর্জ ও প্রাইডকে। রেসকোর্সজুড়ে সে বীরবিক্রমে পরিক্রম করে। প্রাইড এখনো জীবিত রেসকোর্স ময়দানে, এমনকি কলকাতাবাসী তাকে উইলিয়াম সাহেবের সাদা ঘোড়া হিসেবেই চেনে।

~ পার্ক স্ট্রিট কবরস্থান ~

কলকাতা শহরের এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে রাতবিরাতে চলে অলৌকিক সব কর্মকাণ্ড ও প্যারানরমাল অ্যাক্টিভিটিস। নিমতলা, ক্যাওড়াতলা শ্মশান ঘাট খানিকটা আলোময় দেখালেও শহরের প্রাচীন সিমেট্রি ও কবরখানাগুলো কিন্তু এখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন। সাউথ পার্কস্ট্রিট সিমেট্রি তেমনি একটি গোরস্থান। প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৭৬৭ সালে। আবছা অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে দেয়াল আর ঘন গাছপালায় ঘেরা গোরস্থানে গেলেই গা ছম ছম করে ওঠে। এখানে ব্রিটিশ সৈনিকের কবর সবচেয়ে বেশি।

বলা চলে সাহেবি গোরস্থান। শোনা যায়, রাত হলেই নাকি কফিন থেকে জেগে ওঠে শত বছরের পুরনো আত্মা। একবার তো ঘটেই গেল বিপত্তি। এরকম আরও একটি সেমিট্রি রয়েছে লোয়ার সারকুলার রোডে। ঠিক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোডের ওপরে। পর্যটকরা ঘুরতে আসেন ঠিকই কিন্তু রাত হলে ঢোকার সাহস হয় না কারও। এক পর্যটক ছবি তুলতে গিয়ে সাদা পোশাকের আবছা মহিলাকে দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পার্ক সার্কাসের বিশাল কবরখানার মতো স্থান, এ শহরে খুব কম রয়েছে। পার্কস্ট্রিটের আশপাশেরর স্থানীরা খুব সকালে এবং সন্ধার পর তাদের জানালা বন্ধ করে রাখেন। না জানি আবার কখন কি ঘটে যায়। প্রচুর গাছ-গাছালি ঘেরা কবরখানাতে স্থানীয়রা নাকি বহুদিন ধরেই অশরীরী অস্তিত্বের টের পান।

~ রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন ~

মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা কলকাতায় নতুন কিছু নয়। আর সেইসব আত্মহত্যার ৮০ শতাংশই রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে ঘটেছে। সেইসব আত্মহত মানুষদেরই আত্মা নাকি এই স্টেশনে ঘোরাফেরা করে। সারাদিন এই স্টেশন ভীষণ ব্যস্ত থাকে। রাত্রে এখান থেকে শেষতম মেট্রোতে চড়েছেন যারা তারা অনেকেই বলে থাকেন, ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় অনেকে ভাবের ঘোরে খেয়াল হারিয়ে লাইনের দিকে এগিয়ে যায়। একবার রাতের লাস্ট ট্রেনের ড্রাইভার ট্রেন চালাতে চালাতে মাঝ পথে একজন মহিলাকে দেখে ব্রেক করেন, পড়ে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। নির্জন স্টেশনে অনেকে বিভিন্ন ছায়ামূর্তিকেও ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। শহরের ব্যস্ততম মেট্রোস্টেশনে আজও এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটতে থাকে।

তথ্যসূত্র –

https://www.kalerkantho.com

https://m.dailyhunt.in

https://studentscaring.com

https://blog.railyatri.in

https://thrillermaster.com

www.sangbadpratidin.in

https://www.studentscaring.com

www.kalerkantho.com

YouTube Channel: Unknown Mystery Official

লেখায় - ঐকান্তিকা সিনহা

Udyaban

Sristi
Shibpur

আমাদের কথা

Our Timeline

01 — 8th March

UDVABAN

We organised our flagship annual summit 'Udvaban' @Sarat Sadan. Howrah which was attended by donors, followers & well-wishers alike. We launched our very first E-magazine also titled 'Udvaban' at this event.

02 — 24th March

AWARNESS CAMPAIGN

We started our covid 19 awareness campaign on our social media handles. We shared tips on basic hygiene and requested followers to stay indoors.

03 — 29th March

COVID-19 RELIEF FUND

We constituted Covid19 Relief Fund with the intention of providing relief to deprived section of our communities. We also allocated Rs. 12000 from our consolidated fund to start off our campaign.

04 — 30th March

COVID-19 RELIEF

In light of Covid19, we donated dry ration for 1 week for 30 families to Howrah City Police, which was later distributed to the needy under their supervision.

05 — 3rd April

COVID-19 RELIEF

Covid Relief, phase 2 organised in Belpahari. We served approximately 90 families.

06 — 9th April

COVID-19 RELIEF

Covid Relief, phase 3 organised in Belpahari. We served 100 families in villages like Rimradanga, Bnaspahari, Singaduba, Shushnijibi.

Continue ...

Our Timeline

07 — 23rd April

COVID-19 RELIEF

We informed Howrah City Police to two distressed families whom we couldn't reach. HCP took cognisance and they received assistance at the earliest.

08 — 24th April

COVID-19 RELIEF

Covid Relief, phase 4 organised in Belpahari. We served 110 villages in villagers like Kendadumri and Jamboni.

09 — 27th April

COVID-19 RELIEF

We started our Local Food Support Program. So far we have managed to help around 70 families.

10 — 1st May

COVID-19 RELIEF

Our fight continues,few gimpses from our drive today.

11 — 2nd May

COVID-19 RELIEF

Prokash aged 40 is a daily wage laborer who usually does odd jobs to sustain himself and his family. So when the lockdown was imposed, he couldn't earn his living anymore and ran out of his meager savings. Fortunately, Shibpur Sristi has reached out to him.There are many stories like Proksash's where people are fighting everyday trying to survive. Our local food support program is aimed at helping people just like Prokash.

12 — 14th May

COVID-19 RELIEF

Shibpur Sristi is at the forefront of the COVID battle.Our relief team is on the move everyday, delivering relief to families in need across the city. So far we have managed to serve around 400 families and distribute about 1800kgs of relief materials.

Continue ...

Our Timeline

13 — 16th May

COVID-19 RELIEF

Shukla devi, aged 65 yrs old, a senior citizen lives in Howrah all by herself. She suffers from cardio-vascular ailment and needs expensive meds.We have provided her with the necessary medicines .

14 — 17th May

COVID-19 RELIEF

Phase 6 of our relief efforts, we have once again focused on the impoverished areas of Belpahari. This time we distributed food materials to around 30 families in Rangametia with the help of our well-wishers.

15 — 23rd May

Amphan RELIEF

Today we have distributed packets of some dry foods (including Moori (Puffed Rice), Biscuits and Chira [Flattened Rice]) and packaged drinking water among 60 such families residing in nearby Dumurjola slum area.

16 — 25th May

Amphan RELIEF

Today, we distributed food materials to 60 families residing in the slum areas beside Dumurjola Indoor Stadium in Howrah as part of our eighth phase of relief efforts.

17 — 3rd June

Amphan RELIEF

We and Kolkata Festival successfully distributed relief materials along with 6000Li-tres of pure drinking water to 300+ families in Minakha and Sahebkhali of Hingalganj.

18 — 7th June

Amphan RELIEF

As part of phase 2 of Amphan relief efforts we Shibpur Sristi along with Kolkata Festival successfully distributed relief materials and 3000litres of drinking water to 150 families in Mathurapur, Raidghi in the 24 Parganas.

19 — 13th June

Amphan RELIEF

We distributed relief materials to 200 families in Rasulpur,Khejuri in collaboration with Swarnabha Dey and his group of friends.

~ আমফানের সাথে অসম লড়াই তে আমরা

We cannot stop natural disasters but we can arm ourselves with knowledge: so many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness.

- Petra Memcova

হ্যাঁ, উপরোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলেই প্রমানিত হয় সমগ্র বাংলার মানুষ এর কাছে। এই বছরের অর্থাৎ ২০২০ এর মার্চ মাস থেকেই বাংলা তথা সমগ্র বিশ্ব লড়ে চলেছে এক বিশ্বব্যাপী মহামারীর সাথে।যার সাথে আশা করি আমরা আপনারা সবাই খুবই পরিচিত। হ্যাঁ আমি করোনা প্যান্ডেমিক এর কথা বলছি।যখন আমার বাংলার উপর এই রোগ মহামারীর আকার নিচ্ছে এবং লোকে যথারীতি গৃহবন্দী হচ্ছে নিজ প্রাণ ভয়ে ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন মানুষ এর মাথার ছাদ টুকুও কেড়ে নিতে, এসে হাজির হলো এক দানবীয় প্রকৃতিক দুর্যোগ। ২০ শে মে ঠিক দুপুর ২ টো নাগাদ যখন ভয়াবহ এক ঘূর্ণি ঝড়,উম্পুন তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে আছড়ে পরে বাংলার বুকে।এই ঝড়ের সময় বায়ুর গতিবেগ ছিল প্রায় ১৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা থেকে ২৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার মধ্যে।এবং এই ঘূর্ণিঝড় এক রকম পালা করেই বাংলার প্রতিটি জেলায় স্থায়ী হয় প্রায় ৪ ঘণ্টা করে।

অর্থাৎ কল্পনা করা যেতেই পারে যে কি ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন আমরা হতে চলেছিলাম।

আবহাওয়াবিদদের কাছে সমগ্র বাংলা আরও একবার কৃতজ্ঞ হয়ে রইল ঝড়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পূর্বাভাস সবিস্তারে জানিয়ে সতর্ক করে দেবার জন্য।

১৩ই মে ভারত মহাসাগর এর বুকে শ্রীলঙ্কা এর কলম্ব হতে ৩০০ কিলোমিটার পূর্বে এই উম্পুন সৃষ্টি হয়। ইন্ডিয়ান মেটেওলজ্যিকাল ডিপার্টমেন্ট ১৫ই মে থেকে কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখেন এই ঘূর্ণিঝড় কে এবং তার নির্ণয় করা গতিপথকে। তাদের মতে ১৮ই মে এই ঘূর্ণি ঝড় খানিক টা দুর্বল হয়ে আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পৌছিয়ে যায় তার সর্বোচ্চ সীমায়।

এই সমস্ত বিবরণ বাংলার আবহাওয়াবিদরা প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে যাচ্ছিলেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে যাতে তাদের মাধ্যমে মানুষ যথেষ্ট পরিমানে সতর্ক হতে পারেন।

আমাদের এবং আমাদের সরকারের তরফ থেকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে নেওয়া হয় রাতারাতি। একটা বিশাল পরিমান মানুষকে উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সুরক্ষিত এলাকায়।হয়ত কেবল এই কারনেই জীবনহানির পরিমান কমিয়ে আনা যায় একটা বৃহৎ পরিমানে।

২০ শে মে আবহাওয়াবিদদের অনুমান কে সত্যি প্রমাণ করে ঠিক দুপুর ২ টো থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত দফায় বাংলার প্রায় সব জেলায় তাণ্ডব দেখাতে দেখা যায় উম্পুন কে। আর তারপরে! পড়ে থাকে শুধুই ধ্বংসাবশেষ।

১৭০ থেকে ২৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্মুখীন কখনও বাংলার মানুষজন হয়নি।

তাদের চোখের সামনে ভেঙে পড়তে থাকে প্রকাণ্ডকায় গাছগুলি। ভেঙে পড়ে ইলেক্ট্রিক পোস্ট। ক্ষতবিক্ষত হয় মোবাইল টাওয়ার গুলি। উড়ে যায় ঘরের চাল, ভেঙে পড়ে অনেক পুরানো পাকা বাড়িও ।ঝড় শুরু হবার সাথে সাথেই প্রায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে একাধিক গ্রামাঞ্চল সহ একাধিক শহরতলি।১৫০ মিমি থেকে ২৫০ মিমি এর বৃষ্টির জল সামলাতে পারে এমন নিকাশির অভাবে জলমগ্ন হয়ে পরে প্রায় প্রতিটি জেলা।

রাস্তার উপর পরে থাকতে দেখা যায় বিশালাকায় বৃক্ষ গুলো কে যাদের ঝড়ের আগে পর্যন্ত আকাশ এর দিকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকা। বাংলার বুকে ধেয়ে আসা প্রায় প্রতিটি ঝড় কে এতদিন নিজের ম্যানগ্রোভ দিয়ে বাঁচিয়ে এসেছে যে আজ সেই দুমড়ে মুচড়ে যায় উম্পুন এর তাণ্ডব এর ফলে।এই এলাকায় প্রায় সবই কাঁচা মাটির বাড়ি হওয়াতে ভেঙ্গে পড়ে সমস্ত ঘরবাড়ি। একধারে গৃহহীন হয়ে পড়ে ওই সমস্ত অঞ্চলের প্রায় সকল মানুষ। কারো কারো তো সারাজীবনের সঞ্চয় ধুয়ে মুছে নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়ে যায় ওই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। হঠাৎই এত পরিমাণ বৃষ্টির ফলে বেড়ে ওঠে সমুদ্রের জলস্তর এবং তা বেড়ে গিয়ে ঢুকে যায় সুন্দরবন এর মানুষ এর বসবাস্থলে। ভেঙে যায় তাদের কাঁচা হাতে গড়া বাঁধ গুলো। খাবার উপযুক্ত মিষ্টি জলের সাথে মিশে যায় সমুদ্রের লবনাক্ত খাবার অনুপযোগী জল। ঝড়ের পড়ে ঠাহর করা কঠিন হয়ে পরে যে কোনটা রাস্তা আর কোনটা জলাশয়।

এক কথায় ২০০৯ এর ঘূর্ণি ঝড় আয়লা এর পরে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দর বন যে টুকু সামলে উঠেছিল তার সব টাই কেড়ে নিয়ে আরও বেশি ক্ষতি করে গেল ২০২০ এর এই ঘূর্ণি ঝড় উম্পুন।

এমত অবস্থায় প্রতিটি মানুষ এর নিজের অগোছালো হয়ে থেমে পড়া জীবন যাত্রা কে আবারও পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে তাকে পূর্বের ন্যায় সচল করতে সময় একটু লেগেই যায়।

আমাদের সৃষ্টি এর সদস্যদেরও নিজের থেমে যাওয়া জীবন যাত্রা কে সচল করতে যে টুকু সময় লাগে ততটাই নেয় তারা এবং তার পরেই নিজে দের হাত বাড়িয়ে দেয় অসহায় মানুষ দের প্রতি।

মোবাইল টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সংযোগ করা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সৃষ্টি এর সদস্যদের সাথে। তা স্বত্বেও অনেক বাঁধা পেরিয়ে যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠে এবং কাজ শুরু করার পরিকল্পনা শুরু করে দিই আমরা। সবার আগে আমরা আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তাদের সুরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হই। তার পরেই আমরা নিজের শহরের কিছু আশ্রয় হীন মানুষ এর পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা নিই। কারণ আমাদের মাথার উপর ছাদ টুকু থাকলেও অনেক গরীব দরিদ্র এই শহরের বুকেই ফুটপাথ আগলে বসবাস করে যাদের মাথার উপর ছাদ না;জোটে ছেঁড়া ত্রিপল বা কারোর তাও না। আর এই ঝড়ের পরে তাদের কথা ভাবলেও কেঁপে উঠি আমরা। তখনও আমরা জানতাম না গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ দুর্দশার কথা। এই ২০২০ এখনো শেষ হয়নি কিন্তু এই বছর ইতি মধ্যেই আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে।

২৫ শে মে আমরা অর্থাৎ শিবপুর সৃষ্টি শুরু করি আমাদের প্রাথমিক সাহায্য পর্ব।

ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের পার্শ্ববর্তী বস্তি সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৬০ টি পরিবারের হাতে ৪ দিনের আমরা রেশন সামগ্রী তুলেদি। উম্পুন পরবর্তী এটাই আমাদের প্রথম কাজ ছিল।

এই কাজ চলাকালীন আমারা চিন্তা-ভাবনা শুরু করি আমাদের এই আশেপাশের এলাকার থেকে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকা নিয়ে। এবং ইতি মধ্যেই অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওই সমস্ত এলাকার মানুষ দের সাহায্য এর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে।

এটা জানার পর থেকে আমরা খোঁজ নেওয়া শুরু করি যে কোন জায়গার মানুষ এর সব থেকে বেশী সাহায্য এর প্রয়োজন।এবং আমরা ঠিক করি যে একদিন ওই এলাকায় গিয়ে ত্রান বিতরণ করে

আসবো,যাতে তাদের সামান্য কিছু সাহায্য আমরা করতে পারি তাদের এই দুর্দশার দিনে। যারা এই ঝড়ে নিজেদের সব কিছু হারালো তাদের পাশে দাঁড়ানোর আমরা সামান্য এই প্রয়াস শুরু করি সৃষ্টির তরফ থেকে।

কিন্তু এটাও আমাদের মাথায় চলতে থাকে যে এর পূর্বে এমন কোন উদ্যোগ সৃষ্টি নেয়নি কখনও। এবং এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর রিলিফ ফান্ড এ কাজ করার অভিজ্ঞতাও সৃষ্টির কোনও সদস্যের ছিল না।তাই মনের মধ্যে সঙ্কট সবারই ছিল। কিন্তু তার থেকেও বড় জিনিস যেটা সেটা হল আমাদের এই পরিবারের মনের জেদ,হাল না ছাড়া মনোভাব। সেটাই আমরা আমাদের নিজেদের কাছেই আবারও প্রমান করে দিলাম। ওই যেমন কথায় আছে "হাল ছেড়ো না বন্ধু"। হয়তো তাই সকল বাধা পেরিয়ে আমরা আমাদের এই উদ্যোগ কে সফল করতে সক্ষম হই।

এর পূর্বে আমরা অর্থাৎ সৃষ্টিয়ানরা নিজেদের উপস্থিতিতে কোথাও এরুপ রিলিফ ফান্ড এ অংশ গ্রহন করেনি।আমরা আমাদের ত্রান পাঠিয়ে দিয়েছি কোন যানবাহন এর মাধ্যমে থানার সহযোগিতায়। এই প্রথমবার যখন শিবপুর সৃষ্টির টিম নিজে গিয়ে পরিচালনা করল সবটা। এই সব এর জন্য অনেক অর্থেরও দরকার ছিল যা আমাদের একার পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। এই ব্যাপারে আমাদের শিবপুর সৃষ্টি কে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দেশ বিদেশ এর মানুষ জন। সৃষ্টি এর তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয় কলকাতা ফেস্টিভ্যাল এর সাথে এবং তারাও আমাদের এই উদ্যোগে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এর পর আমরা আমাদের ত্রান সামগ্রী কেনা কাটা শুরু করে দিই।যেটা ছিল অন্যতম এক কঠিন কাজ।

আমাদের প্রথম কাজ ডুমুরজলা হলেও এবার আমরা ঠিক করেছিলাম রওনা দেব সুন্দরবন এর উদ্দেশ্যে এবং যেমন ভাবা তেমনই কাজ।

৩ রা জুন ৬০০০ লিটার জল, মুড়ি, ছাতু, ও.আর.এস সহ নানান শুকনো খাবার নিয়ে ভোর ৬ টায় আমাদের পরিবারের কিছু সদস্য একটি ট্রাকে চড়ে রওনা দেয় হিঙ্গলগঞ্জ এর উদ্দেশ্যে।

এই সদস্য এর মধ্যে ছিল সুমিত সামন্ত,দেবজ্যোতি বাগ, সুপ্রতীম মুখার্জী, রাহুল দত্ত, দেবপ্রিয় ঘোষ, অভিরুপ সাঁতরা, দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সৌরভ কোলে। এছাড়াও আমাদের সাথে ছিলেন সেপিয়েন্স

ওয়েলফেয়ার এর তরফ থেকে সৈকত হাজরা এবং সাথে ছিলেন অভিজিত। সাথে ছিল আরও একটা ট্রাক যেটায় ছিল কলকাতা ফেস্টিভ্যাল এর তরফ থেকে ওই মানুষ গুলোর উদ্দেশ্যে পাঠানো ত্রান সামগ্রী।

এই দুই ট্রাক এগিয়ে চলে মানুষ এর পাশে দাঁড়াতে। সকল সদস্য এর মনেই উত্তেজনা বাসা বাঁধতে থাকে এবং সাথে ভয়ও।উত্তেজনা মানুষ কে সাহায্য করার আর ভয় একা এত দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করার।

সঠিক জায়গা থেকে এই দুই ট্রাক চলে যায় তার ২ গন্তব্য এর উদ্দেশ্যে।একটি ট্রাক চলে যায় লেবুখালি ঘাট এবং অন্যটি মিনাখা গ্রামে।

লেবুখালি ঘাট থেকে ভটভোটি করে হিঙ্গলগঞ্জ এর সাহেব খালি গ্রামে আমরা পৌঁছিয়ে সেখানের পঞ্চায়েত এর সহায়তায় প্রায় ৩০০ পরিবারের হাতে একে একে আমরা আমাদের সাথে আনা রেশন তুলে দিই। এই ত্রান পর্ব শেষ হতে হতে প্রায় সন্ধে ঘনিয়ে আসে এবং ত্রান শেষে সেখানের পঞ্চায়েতকে আমাদের সাথে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অত গুলো মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে খুশি মনে ফেরত আসে সৃষ্টির সদস্যরা।

সফলতা অর্জন করে আমাদের প্রথম আয়োজিত করা এতো বড় একটি প্রকল্প।

এখানেই থেমে থাকেনি সৃষ্টি।আমরা ফিরে এসেই আবারও তৈরি হতে শুরু করে দিই আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মথুরাপুর রায়দিঘীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবার জন্য।

৭ই জুন "জলই জীবন"- এই প্রকল্প কে মাথায় রেখে আবারও ৩০০০ লিটার জল, ত্রিপল,শুকনো খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আবারও আমরা রওনা দিয়ে দিই মথুরাপুর এর রায়দিঘীর উদ্দেশ্যে।সেখানের প্রায় ১৫০ টি পরিবারের হাতে আমরা এই সামগ্রী তুলে দিই।

এই বারের আমাদের এই উদ্যগ্যে আমাদের সাথে ছিলেন সৃষ্টির সুমিত সামন্ত, ঋতব্রত দাস,দেবজ্যোতি বাগ,রাহুল দত্ত,অভিরুপ সাঁতরা, সৌরভ কোলে,অরিজিত মণ্ডল, শুভাশিস নাথ, সুপ্রভাত আদক, অতীশ সিং, অনিমেষ পল্ল্যে এবং অভিজিত।

এই বারেও আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন কলকাতা ফেস্টিভ্যাল।

আমাদের এই সদস্যরা ৭ই জুন ভোর ৬ টায় রওনা দেয় তাদের গন্তব্য-এর উদ্দেশ্যে এবং প্রায় রাত্রি ১০ টা নাগাদ তারা তাদের কাজ সফল ভাবে মিটিয়ে ফেরত আসে নিজের শহরে।

এর পর মাত্র কিছু দিনের বিশ্রাম তার পড়েই আবার সৃষ্টি তৈরি হতে থাকে পরবর্তী গন্তব্য-এর উদ্দেশ্যে।

সৃষ্টি যেন শেখেইনি থেমে থাকতে,

তাই, ১৩ই জুন আবারও সৃষ্টি এর কিছু সদস্য যেমন সুমিত সামন্ত, দেবজ্যোতি বাগ, সৌরভ কোলে, ঋতব্রত দাস, রাজা দাস, ডিনা দাস, অরিজিত মণ্ডল, সৌমী বসু, এবং দিব্যেন্দু কোলে রওনা হয় রাসুল্লর এর খেজুরি এর উদ্দেশ্যে।

যাত্রার সময় পূর্ববর্তী দিন গুলোর মতো হলেও এই দিন আমাদের পথে বহু প্রতিকূলতা আসে।

যে ট্রাক আমাদের খেজুরির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল সেটিকে জগদ্দল বলাই শ্রেয় বলে আমার মনে হয়। কারণ ওই জগদ্দল প্রথম থেকেই তার বিগড়নোর প্রবণতা প্রকাশ করতে থাকে। সেটির টায়ার পাঞ্চার হয়ে যায় যাত্রা শুরুর মাত্র কিছুক্ষণ এর মধ্যেই। এছাড়াও প্রবল বর্ষণ এর সম্মুখীনও হতে হয় আমাদের। এবং আবারও একবার টায়ার পাঞ্চার হয় আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর ঠিক মিনিট ৩০ পূর্বে।

শুধু তাই নয়। ফেরার সময়ও ওই জগদ্দল এর একাধিক যান্ত্রিক গোলযোগ সে একে একে প্রকাশ করতে থাকে ।জাতীয় সড়ক ৬ এর উপর ধুলাগড় এর কাছে এসে তো সে আর এগোতেই চায় না।শেষে অনেক চেষ্টার পর তাকে স্টার্ট করিয়ে কোনও রকমে নিজ গৃহে ফেরে সৃষ্টির সদস্যরা। এহেন প্রতিকুলতার জন্য সেদিন আমাদের সদস্যদের বাড়ি ফিরতে সময়ের ঘড়িতে বেজে যায় প্রায় রাত ২টো।

এতো কিছুর পরেও তারা সেদিন তাদের লক্ষ্য পুরন করে তবেই ফিরেছিল।তারা খেজুরি বাসির হাতে তুলে দিয়েছিল চাল,আলু, ডাল, সোয়াবিন,তেল, চিনি,সাবান,নুন এবং মাস্ক।

এই দিন এসে একটু বুক ভরা নিঃশ্বাস নেয় তারা। তারা সফল হয়েছে।হ্যাঁ সফল হয়েছে,তারা পেরেছে কিছু মানুষ এর মুখে হাসি ফোটাতে।

এই সমস্ত উদ্যোগ কে সফল ভাবে পরিচালনা করার জন্য সৃষ্টি কৃতজ্ঞ তার পরিবারের সকল সদস্য এর কাছে,কারণ কেউ একা এরূপ একটা উদ্দেশ্যকে কখনও সফলতার রূপ দিতে পারত না। সৃষ্টির প্রতিটি সদস্য এই লড়াই টা লড়ে গেছে নিঃস্বার্থ ভাবে।

যে সমস্ত সদস্যরা বর্তমানে করোনা প্যানডেমিক এর দরুন হওয়া লকডাউন এর দরুন আমাদের এই প্রকল্প গুলতে নিজেরা উপস্থিত থাকতে পারেনি তারাও নিজের বাড়িতে বসেই সমানে যোগাযোগ রেখে চলেছিল তাদের সাথে যারা দূরে গেছিল মানুষ এর পাশে দাঁড়াতে। না তারা একা ছিল না।তাদের পাশে ছিল পুরো সৃষ্টি পরিবার।

এটাই তো অন্যতম বৈশিষ্ট্য আমাদের এই পরিবারের। আমরা একে অপরের পাশে থাকি সর্বদা।

কেবল নিজের ক্ষমতা মতো ত্রান বা টাকা টুকু দিয়ে সরে আসিনা আমরা।তাই এই সমস্ত কিছু লিখতে গিয়ে একজন সৃষ্টির সদস্য হয়ে আমার অর্থাৎ তপেন্দু বাকুলীর মুখে সেই গর্বের হাসি টা কিন্তু লেগেই আছে।

আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষ এর সেবায় তাদের পাশে সর্বদা মজবুত খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

সৃষ্টি ঠিক যেভাবে আগেও ছিল,তেমন ভাবেই আজও এবং আগামী দিনেও এই একই ভাবে প্রস্তুত থাকবে যে কোন পরিস্থিতিতে মানুষ কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে।

"NOT HOW LONG, BUT HOW WELL YOU HAVE LIVED IS THE MAIN THING"

-SENECA

এই প্রকল্প গুলির মাধ্যমে হয়তো আমরা নিজেরা একটুও লাভবান হতে পারিনি কিন্তু প্রতিটা দিন সফল ভাবে ত্রাণ বিতরণ করে ট্রাক এর পেছনে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করেছি। আমরা কুড়িয়ে এনেছি অনেক গুলো স্মৃতি এবং অনেকটা অভিজ্ঞতা যা আগামী দিনে আমাদের কাজে নিশ্চিত সহায়তা করবে।

সৃষ্টি ধন্যবাদ জানায় কলকাতা ফেস্টিভ্যাল কে। সাথে সাথে ধন্যবাদ জানায় সুন্দরবন পুলিশ প্রশাসনকে আমাদের কাজে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য।

আজ আমরা গর্বিত এতো গুলো মানুষ এর পাশে দাড়িয়ে।আমরা গর্বিত এই পরিবারের সদস্য হয়ে।

"YES WE ARE SRISTIANS & WE ARE PROUD ABOUT THAT"

==========

~ সাক্ষাৎকার ~

~ কৌস্তুভ চ্যাটার্জী

Q : এই 'লকডাউনে' কেমন আছো ?

>> লকডাউনে আমি এবং আমার পরিবার ভালো আছি কিন্তু বাইরের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি কারণ আমাকে work-from-home করতে হচ্ছে।

সব মিলিয়ে অফিসের লোকজনদের সাথে অথবা সৃষ্টির লোকজনদের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ একটা আছে। কিন্তু বাইরের পরিস্থিতি, যাদের অবস্থা সচ্ছল নয় তাদের কাছে সামান্য সাহায্য পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের শিবপুর সৃষ্টি তরফ থেকে কিন্তু তা ছাড়াও আরো অনেকে আছেন যাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারছিনা। অনেকেই খুব দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন জানি না তাদের কাছে কিভাবে সাহায্য পৌঁছে যাবে। আশা করি পরিস্থিতি খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়। এই ভীষণ পরিস্থিতি যতক্ষণ না ঠিক হচ্ছে নিজেদের অবস্থার চিন্তার থেকে বেশিরভাগ সময় বাইরের পরিস্থিতির কথা আমার কাছে সব থেকে বেশি চিন্তনীয়।

Q : শিবপুর সৃষ্টিতে যুক্ত হওয়া টা কিভাবে একটু যদি বলো ?

>> সৃষ্টির শুরু যখন হয় ৮-১০ জন মিলে। রেজিস্ট্রেশন এর সময় আট - দশজনের খুবই প্রয়োজন ছিল তখন থেকেই আমি আছি। পুরানো অনেকেই যেটা বলেছে আমিও সেটাই বলবো যে একদিন বন্ধুরা আড্ডা দিতে দিতে ভাবনা আসে দুঃস্থদের জন্য কিছু করার। আর সেখান থেকেই আজকের সৃষ্টি। সেভাবে বলতে গেলে যুক্ত হওয়া বলতে প্রথম থেকেই আছি। আর সত্যি কথা বলতে আজ ৫-৬ বছর পর সৃষ্টি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সমস্ত সৃষ্টিয়ান এবং শুভাকাঙ্খী দের।

Q : সৃষ্টি একটা বড় পদমর্যাদা পেয়েছে। সবাই চিনছে সবাই জানছে, এটা একটা বড় ব্যাপার ।

>> এছাড়াও সৃষ্টিতে যে সদস্যরা রয়েছে তাদের বাইরের পৃথিবীতে মেশার জন্য অনেক কিছু শেখাচ্ছে। কর্মজীবনেও আমাকে শিবপুর সৃষ্টি অনেকটা সাহায্য করেছে। আমার কর্মক্ষেত্রে আমি যে একজন শিবপুর সৃষ্টির সদস্য সেই হিসাবে আমাকে ওরা খুব উৎসাহিত করে এবং ওনারাও সৃষ্টিতে অনেক কাজে সাহায্য করে।

>> আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও শিবপুর সৃষ্টি একটা অংশ ।

Q : আমাকে একটু যদি তোমার প্রথম প্রোজেক্টের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলো ?

>> প্রথম নলপুর প্রজেক্ট এ আমি থাকতে পারিনি। তবে আমার প্রথম প্রজেক্ট আমার দিক থেকে ডিসেম্বরের উইন্টার ড্রাইভ কালীঘাট চেতলা দিকে রাস্তাটায় যতসব দুঃস্থ মানুষ ছিল তাদেরকে নতুন পুরনো সব রকম জামা কাপড় কম্বল যেগুলো আমরা কালেক্ট করেছিলাম সেই সময় সেগুলো আমরা দিতে দিতে যাচ্ছিলাম। দিনের শেষে বা বলতে পারো কাজের শেষে একজন ভদ্রমহিলা আমার কোলে ১৭ দিন বা ২৭ দিন এর একটি বাচ্চাকে তুলে দিয়ে বললেন এর জন্য তোমরা কিছু একটা করো। জীবনে প্রথমবার ঐটুকু একটা বাচ্চাকে আমি কোলে নিয়েছিলাম। আমাদের কাছে অবশিষ্ট যা কম্বল যা আমাদের কাছে ছিল সেখান থেকে ওনাকে দিয়েছিলাম। এটা ভাবছিলাম যে সত্যিই অনেক মানুষ আছেন যাদের সাহায্য সত্যিই দরকার। ওনাদেরকে সাহায্য করার পর , ওনাদের মুখে যে হাসি সেটা কোনদিনও টাকা দিয়ে সম্পূর্ণ করা যায় না। ওইটাই আমাদের return gift.

Q : পাড়াতে সৃষ্টি তৈরি হয়েছিল বলে কি সৃষ্টিতে যোগ দেওয়া নাকি প্রথম থেকেই এরকম কোন ইচ্ছা ছিল লোকেদের বা বাচ্চাদের সাহায্য করা ?

>> ছোট থেকেই দুঃস্থদের সাহায্য করার একটা মনোবৃত্তি তো ছিলই এছাড়া কলেজে যাওয়ার পথে এবং অন্যান্য ভাবেও সাহায্য করতাম। সৃষ্টি হতে এই কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

Q : সৃষ্টিতে তোমার কাজের ভূমিকা যদি বলো ?

>> বিশেষত আমাদের শিবপুর সৃষ্টিতে অনেকরকম বিভাগে কাজ করা হয় সেগুলো আমাদের rotation wise চলতে থাকে। অফিশিয়াল বিভাগের মধ্যে আমি ফটোগ্রাফি টিমে আছি আর পরিধানে আছি।

প্রথমে পরিধানের কথা বলি , পরিধানের প্রধান কাজ হল একটা রোড ম্যাপ রেডি করা যে পরিধান এ কী কী কাজ হবে । পরিধান এখন কি করবে শুধুমাত্র সেটা নয় আগামী পাঁচ বছর বা দশ বছরের মধ্যে আরো কি করা যেতে পারে সেই ধরনের রোডম্যাপ তৈরি করা হয় ,যেটা আমরা সবাই ভাগ করে করি। ফিল্ডের কাজ অনিমেষ দেখে। পেপার ওয়ার্ক এর কাজ, গভর্নিং বডির সাথে আলোচনা করা এইসবের কিছুটা আমি করি।

এবার আসি ফটোগ্রাফি তে, এই মুহূর্তে ফটোগ্রাফিতে আমাকে খুব একটা কাজ করতে হয় না, যারা নতুন আছে তাদেরকে গাইড করা ছাড়া। তবে সৃষ্টির প্রথম দিকে যখন সেভাবে কোনো টিম হয়নি তখন ফটোগ্রাফির যা কাজ থাকত বেশিরভাগ টাই দেখতাম। এছাড়া অন্যান্য আলোচনা বা দরকার মত কাজ তো আছেই।

Q : তোমার করা এতগুলো প্রজেক্ট এর মধ্যে কোনটা তোমার সব থেকে প্রিয় ?

>> সব প্রজেক্ট প্রিয় আমার কাছে তবে যদি নাম ধরে বলা যায় প্রথমে যে গল্পটা বললাম সেটা তো বটেই এছাড়াও দ্বিতীয়ত আমরা এসআই তে একটা কাজ করতে গেছিলাম special child, orphan এদের নিয়ে । যেখানে আমাদের কোলাজের কাজ করানো হয়েছিল। বাচ্চাদের নানা ধরনের চিন্তাভাবনা, তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা খেলা করা এটা আমার ভালো লেগেছিল। ওদের সাথে কিভাবে sign language এ কথা বলতে হয় সেটা বেশ শিক্ষণীয় ছিল।

Q : একজন সৃষ্টিয়ান হিসেবে সৃষ্টির জন্য কি বলবে ?

>> ভাল কাজ করুক, আরও বড় হোক।

Q : এবার একটা রাপিড ফায়ার রাউন্ড আছে অবসর সময়ে সিনেমা দেখা না বই পড়া ?

>> দুটোই।

Q : শপিং মল থেকে জামা কাপড় কেনা না দরদাম করে কেনাকাটা করা ?

>> নির্ভর করছে সেটা মাসের শুরু না শেষ।

Q : বিরিয়ানি না ফুচকা ?

>> বিরিয়ানি।

Q : সৌরভ গাঙ্গুলী না শচীন টেন্ডুলকার ?

>> সৌরভ গাঙ্গুলী।

Q : পাহাড় না সমুদ্র ?

>> পাহাড়।

Q : চা না কফি ?

>> গ্রিন টি আর ডালগেনো কফি বাদে বাকি সবই চলে (যদিও উত্তর টা সংগৃহীত। হাঃ হাঃ) ।

Q : শিক্ষন ,পরিধান ,সবুজ সংকল্প এই তিনটেকে ১ ২ ৩ হিসেবে সাজালে কোনটাকে কিভাবে সাজাবে ?

>> ১. শিক্ষণ ২. পরিধান ৩. সবুজ সংকল্প ।।

~ সুমন চৌধুরী

Q : এই লকডাউনে কেমন আছো ?

>> ভালো আছি, বাড়িতেও সবাই ভাল আছেন, লকডাউন মেনে বাড়িতেই আছি সবাই ।

Q : বাচ্চা বা দুঃস্থ মানুষদের জন্য কিছু করার চিন্তা ভাবনা কীভাবে এল?

>> চিন্তা ভাবনা বলতে আশেপাশের পরিবেশ দেখে দুস্থ মানুষদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা হত। আমরা সবাই নিজের নিজের জীবনে ব্যস্ত, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সমাজের জন্য একা কিছু করা সম্ভব নয়। তারজন্য একটা ঠিক ঠাক way out লাগে । আর সৃষ্টি এমন একটা সংস্থা যার সাথে যুক্ত হলে আমি সমাজের জন্য কিছু করতে পারব, তাই সৃষ্টি তে যোগদান ।

Q : সৃষ্টির কথা কীভাবে জানলে ?

>> সৃষ্টির কথা জানতে পারি আমার বন্ধু তুহিনের কাছ থেকে। আমার ভালো লাগে এই ধরনের কাজ করতে এবং ইচ্ছা ছিল এই রকম সংস্থার সাথে যুক্ত হবার । কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে ওঠেনি, এখন যখন যুক্ত হয়েছি চেষ্টা করব নিজের best টা দিতে।

Q : এখন তো আরও অনেক NGO কাজ করছে ! বাচ্চাদের জন্যও সাহায্য করছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সৃষ্টি কে কেনো বেছে নিলে ?

>> প্রথমত, এর আগেও আমি হরিজন সেবক সংঘ এ কাজ করেছি । তবে আমি সামনে থেকে কাজ করিনি । ওখানে যে কাজ গুলো হয় সেগুলো ওদের জায়গাতেই হয়। কিন্তু আমার ওখানে সরাসরি যুক্ত থাকা হয়ে ওঠেনি । কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে যা দেখেছি কাজের ধরণ গুলো একদম আলাদা । On spot

কাজ হয়,সত্যিই যাদের সাহায্যের দরকার সেই রকম জায়গায় কাজ হয় এবং সেই কাজ গুলোর পরবর্তী প্রেজেনটেশান টাও ভীষণ ভালো । (এই প্রসঙ্গে অনেকে হয়তো বলে যে প্রচারের কী দরকার! সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এটা ঠিক,এগুলো Show off নয়,যে কাজ গুলো হচ্ছে সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার যাতে আরও বেশী সংখ্যক মানুষকে সাহায্য করা যায়) আমি দীর্ঘদিন সৃষ্টির Facebook page Follow করতাম বেশ ভালো লাগতো কাজগুলো । সেই ভালোলাগা থেকেই সৃষ্টি তে যোগদান ।

Q : সৃষ্টি তে কতদিন হলো ?

>> অল্প কিছুদিন মাত্র, মাসখানেক। উদ্ভাবন এর অনুষ্ঠানে Participate করেছিলাম তবে officially সৃষ্টির volunteer হয়েছি 15th March এ।

Q : উদ্ভাবনের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো?

>> তুহিন র আমন্ত্রণে আসা এবং Participate করা । ভালো লেগেছে অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে । আমি ব্যক্তিগত জীবনে গানের সাথে যুক্ত, ওটা ভালোবাসার জায়গা আর তাই উদ্ভাবনে যোগদান করতে পেরে ভীষণ ভালো লেগেছে ।

Q : সৃষ্টির তিনটি Brand - পরিধান, শিক্ষণ, সবুজ সংকল্প । এর মধ্যে তুমি কোনটাকে আগে রাখবে আর কেন ?

>> শিক্ষণ।

কারণ, আজকে আমরা একটা মানুষকে সাহায্য করছি বিভিন্ন ভাবে, যেমন :- পোষাক-আষাক, খাবার সামগ্রী দিয়ে। এখন যদি আমি একটা শিশুকে বাকি জিনিস গুলোরসাথে ঠিকঠাক শিক্ষাটা দিতে পারি তবে পরবর্তীকালে সে নিজে সাবলম্বী হয়ে নিজের প্রয়োজন গুলো মেটাতে পারবে এবং অন্য আরও মানুষকে সাহায্য করতে পারবে।

Q : সৃষ্টির সম্বন্ধে যদি কিছু বলো।

>> এখনও পর্যন্ত সেভাবে কিছু দেখার সুযোগ হয়নি, তবে অনেক শুনলাম সমস্ত কাজের ব্যাপারে । এর মধ্যে সৃষ্টি বেলপাহাড়ির গ্রামের মানুষের যে basic needs গুলো পূরন করার চেষ্টা চালাচ্ছে এটা ভীষণ ভালো । সৃষ্টির কাজের system টা খুব ভালো, প্রত্যেকটা কাজের আলাদা আলাদা টিম আছে । প্রত্যেকের আলাদা দায়িত্ব দেওয়া আছে। কোনও কাজ Puzzle হয়ে যায় না সমস্তটা একদম systematically হয় , এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লেগেছে । Founders member / Senior members দের সাথে volunteers দের communication খুব ভালো, সবাই সমস্ত কাজে সহায়তা করে ।

Q : এবার একটা Rapid fire আছে ।

অবসর সময়ে সিনেমা দেখা না বই পড়া?

>>সিনেমা

Q : শপিং মলে কেনাকাটি নাকি দরদাম করে ?

>> শপিং মলে ।

Q : শচীন না সৌরভ?

>> শচীন ।

Q : পাহাড় না সমুদ্র?

>> সমুদ্র ।

Q : বিরিয়ানি নাকি ফুচকা?

>> বিরিয়ানি ।

Q : এসপ্লানেড নাকি গড়িয়াহাট ?

>> এসপ্লানেড।

Q : চা না কফি?

>> কফি ।

Q : শেষ প্রশ্ন পরিধান, শিক্ষন, সবুজ সংকল্প কে ১ ২ ৩ হিসেবে কোনটাকে কত নম্বরে রাখবে ?

>> ১. শিক্ষন, ২. পরিধান, ৩. সবুজ সংকল্প

~ শ্রীজিতা বাগ

Q : এই লকডাউনেকেমন আছো?বাড়িতে সবাই কেমন আছেন?

>> খুব ভালো নেই ।আবার খুব খারাপও নেই। বাড়িতে সবাই ভাল আছেন, সবার সাথে আছি তাও মনে হচ্ছে কবে সবার সাথে দেখা হবে, কবে আবার কাজে ফিরতে পারবো!! কিন্তু আমাদেরই স্বার্থে লকডাউন মানতে হবেই।

Q : সৃষ্টির সাথে যুক্ত হওয়া কীভাবে?

>> Founder member দের সাথে প্রথম থেকেই আমিও ছিলাম। যেহেতু আমাদের একসাথে বড়ো হয়ে ওঠা সেহেতু শুরুর আলোচনা থেকেই আমি ছিলাম।ওদের মুখে সৃষ্টি তৈরির বিভিন্ন পরিকল্পনা শুনে ভালো লাগা এবং ওদের সাথে কাজ করা শুরু ।

Q : তোমার প্রথম প্রজেক্ট কী ছিল?

>> আমার প্রথম প্রজেক্ট ছিল পুজো প্রজেক্ট।

Q : কী রকম ছিল সেটা যদি একটু বলো ।

>> সেই সময়ে আমাদের কাছে না ছিল সেরকম লোকবল আর না ছিল কোনও ডোনেশন ।আমরা ঠিক করি কিছু জামাকাপড় নিয়ে বেরোবো এবং রাস্তার ধারে যে সমস্ত বাচ্চাদের দেখা যায় পুজোর সময়ে ভিক্ষা করতে তাদের দেওয়া হবে। আমরা রাতের দিকে বেরোই এবং ঠাকুর দেখতে দেখতে বিভিন্ন জায়গার এরকম বাচ্চাদের দিতে থাকি। কিন্তু একটা সমস্যার সম্মুখীন হই। -- ব্যাপারটা হয় আশপাশের

মানুষজন জানতে পেরে আসতে শুরু করে , আমাদের কাছে খুব কম জামাকাপড় থাকায় আমাদের ফিরে আসতে হয়। আমারা সিদ্ধান্ত নিই যে এইভাবে আর বিতরন করব না।

Q : সৃষ্টি তে যুক্ত হওয়া কেন ?

>> একটু বড়ো হবার পর থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা ছিল কিছু করার। কিন্তু একজন ছাত্রী হিসেবে আমার সেভাবে কিছু করার ছিল না বা পরবর্তীকালে চাকরি পাবার পরও একার পক্ষে সমাজের জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না । তারপর যখন সৃষ্টির আলোচনা শুরু হয় তখন থেকেই সৃষ্টির সাথে যুক্ত হওয়া এবং এতটা পথ অতিক্রম করা।

Q : বর্তমানে তুমি সৃষ্টির আইডিয়া মাইনিং টিম এর রিভিউয়ার তো তোমার কাজটা কী?

>> Reviewer র কাজ হল টিম যে Idea গুলো দেয় সেগুলো Re-check করা, টিম ঠিক ভাবে চলছে কীনা সেটা দেখা। Tuhin আছে Ideaming Team এ তো Tuhin সব সময় সমস্ত কাজ আলোচনা করে যে দিদি কাজটা কীভাবে করা যায় বা কিছু Idea দাও। আমি শুধু Team র Reviewer হিসেবে কাজ করিনি বাকিদের মতো Team র একজন হয়েই কাজ করেছি।

Q : তোমার পছন্দের / প্রিয় Project কোনটা ?

>>একবার খেঁজুরীতে গিয়েছিলাম জ্যাকেট দিয়েছিলাম এবং ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, ওই প্রজেক্ট এর অভিজ্ঞতাটা আমার মনে থাকবে । ওই অনাথ আশ্রমটা এখানকার অনাথ আশ্রম গুলোর মতো না অতটা স্বচ্ছল নয় ওদের কাছে একদিন মাংস ভাত খাওয়াটা স্বপ্নের মতো। ওখানকার বাচ্চারা ভীষণ রকমের Attractive, আমরা গিয়ে পৌঁছানোর পর বাচ্চা গুলো নিজেরাই ফুল তুলে এনে চন্দন দিয়ে আমাদের বরণ করে নেয় এবং তারপর ওদের সাথে সারাদিন কাটিয়ে ওদের যে হাসিটা দেখতে পেয়েছিলাম ওটা সৃষ্টি র সাফল্য ছিল ।

Q : একজন সৃষ্টিয়ান হিসেবে যদি তোমাকে সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলতে বলি কী বলবে ?

>> জিরো থেকে হিরো হওয়া বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা সৃষ্টি। একটা সময় শুধুমাত্র আমারা নিজেদের মতো করে কিছু দিয়ে সাহায্য করতাম, আর এখন আমাদের অনেক মানুষের সাহায্য আসে। যার মাধ্যমে আমরা একটা জায়গার বদলে তিনটে জায়গায় একসাথে কাজ করতে পারি । আমরা যখন শুরু করি তখন আমারা এতকিছু ভাবিনি, তখন আমরা কয়েকজন মিলে ঠিক করি আমরা নিজেরা যতটা পারবো বাচ্চাদের জন্য করে যাব। আস্তে আস্তে এই কয়েক বছরে সৃষ্টি অনেক এগিয়ে গেছে। আজ আমাদের কাছে সেই লোকবল বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে যা শুরু র সময় ছিল না। এখন সৃষ্টিকে সবাই মিলে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছি এবং অনেক বাচ্চাদের সাহায্য করতে পারছি।

Q : এবার একটা Rapid fire আছে ।

>> আচ্ছা ।

Q : অবসর সময়ে সিনেমা দেখা না বই পড়া?

>> সিনেমা দেখা

Q : শপিং মল এ কেনাকাটি নাকি দরদাম করে ?

>> শপিং মল ।

Q : শচীন না সৌরভ?

>> শচীন ।

Q : পাহাড় না সমুদ্র?

>> সমুদ্র ।

Q : বিরিয়ানি নাকি ফুচকা?

>> বিরিয়ানি ।

Q : এসপ্লানেড নাকি গড়িয়াহাট ?

>> এসপ্লানেড

Q : চা না কফি?

>> চা ।

Q : শেষ প্রশ্ন!! পরিধান ,শিক্ষণ , সবুজ সংকল্প । কোনটাকে কত নম্বরে রাখবে ?

>> 1. পরিধান, 2. শিক্ষণ, 3. সবুজ সংকল্প

~ তপেন্দু বাকুলি

Q : লকডাউন এ কেমন কাটছে ?

>> লকডাউন এ বিশেষ কিছু ভালো কাটছে না আগে কলেজের সময়টা মনে হতো বেকার, এখন মনে হয় কলেজের সময় টাই বেশি ভালো ছিল। একটা ঘরবন্দি জেলবন্দি অবস্থায় কাটছে ।

Q : বাচ্চাদের জন্য কিছু করার চিন্তা ভাবনাটা কখন মাথায় এলো এবং কেন এলো ?

>> সৃষ্টি বাচ্চাদের জন্য অনেক বেশি কিছু চিন্তা করে, সৃষ্টির দুটি স্কুল নেওয়া আছে। এখনো অনেক জায়গায় বাচ্চারা ঠিকমতন খাবার পায়না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে খাবার অভাব সেইখানে পড়াশোনাটা কিভাবে করানো যায়?

এইভাবে প্রশ্নটা মাথায় আসে ওদের জন্য কিছু করার।

Q : সৃষ্টির কথা তুমি জানলে কোথা থেকে ?

>> সৃষ্টির কথা জানি দেবপ্রিয় আর অমিত ওদের কাছে ।ওরা দুজন আমার খুব পুরনো বন্ধু , অনেক বছর থেকেই শুনেছি কিন্তু সৃষ্টির সাথে যোগদান করে ওঠা হয়নি। এছাড়াও এনজিওর নামে অনেক খারাপ কাজ ভেতরে চলে _ যেমন ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করা। আমি যখন দেখলাম এখানে ভি.আই.পি হিসেবে কোন নেতা মন্ত্রী কিংবা অন্য কোন ধনী ব্যক্তি নয়। কোনো হেডমাস্টার কিংবা কোনো পর্বতারোহী এখানকার ভিআইপি, এছাড়া আমার বন্ধু কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে না এখানে যোগ দেওয়া যেতে পারে এদের কাজ ভালো।

Q : এরকম অনেক এনজিও আছে যাদের পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই যারা বাচ্চাদের জন্য অনেক কিছুই করছে সেইসব এনজিওদের বাদ দিয়ে সৃষ্টিতে যোগ দেওয়ার কারণ কি?

>> ভালো প্রশ্ন। আমি যেখানে ডোনেট করব সেখানে দেখবো আমার কেউ বিশ্বস্ত আছে কিনা সে যেগুলো ডোনেট করছে সেগুলোর ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছেছে কিনা। আমি যখন দেখছি আমার সেই বন্ধু ডোনেট করছে এবং সেই জায়গাটা যখন ঠিকঠাক রয়েছে, জিনিসগুলো ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে আমি অন্যদিকে কেন যাব! যখন আমি ভেতরকার ব্যাপারটা জানতে পারছি ঠিকঠাক কাজ চলে জানতে পারছি আমি সেই জায়গাতেই যাব, যেখানে আমি ভেতরকার খবর কিছু জানতে পারছি না আমি সে সব জায়গায় কেন যাব !

Q : কতদিন সৃষ্টিতে আছো?

>> দুমাসও হয়নি হয়তো।

Q : সৃষ্টিতে যুক্ত হবার পর কোনো প্রজেক্টে কী কাজ করেছো ?

>> না সে রকম ভাবে কোন কাজ পাইনি তবে সৃষ্টির বার্থডে সেলিব্রেশন ৮ই মার্চ সেটাতে আমি ছিলাম আর তার জন্য যে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে আমি যোগদান করেছিলাম, সেখানে আমি খুবই আনন্দ করেছি।

আমি বাড়িতে গিয়ে একটা কথাই বলেছিলাম এখানে গিয়ে আমার মনে হয়নি যে আমি এখানে প্রথমবার এসেছি। একটা পুরো পরিবারের মত আপন করে নেওয়া।

Q : শিক্ষণ আর পরিধান আমাদের সৃষ্টির দুখানা বড় ব্র্যান্ড। তোমার কাছে কোনটা বেশি দরকার বলে মনে হয়?

>> আমি শিক্ষণ টাকে বেশি গুরুত্ব দেব। অবশ্যই পরিধানটাও দরকার আমাদের। দুটোর গুরুত্বই বেশি। যদি কেন জিজ্ঞাসা করা হয় সেটা বলা আমার কাছে খুব কঠিন। কিন্তু শিক্ষণ কে আমি বেশি গুরুত্ব দেব।

Q : এখন আমাদের করোনা রিলিফ ফান্ড চালু হয়েছে। আমাদের বেলপাহাড়ির বাচ্চা ও তাদের পরিবারের কাছে সৃষ্টি খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে পৌছে দিচ্ছে । সেটা নিয়ে কি বলবে ?

>> আমি শুনেছিলাম আমাদের সৃষ্টির ভলেন্টিয়ার দের মধ্যে এই চারজন পাঁচজন গিয়ে এই কাজগুলো করত বেলপাহাড়ীতে। যেহেতু এখন এটা অন্যদের দ্বারা কাজ হচ্ছে, তাই ব্যাপারটা আমি খুব একটা বেশি সায় দিতে পারছিনা।

Q : সবকিছু মিলিয়ে শিবপুর সৃষ্টির জন্য তুমি কি বলবে?

>> শিবপুর সৃষ্টিতে আমি সরাসরি যোগদান করিনি প্রথমে আমি নাটকের জন্য এসেছিলাম যখন অনুষ্ঠানের জন্য সবাইকে তৈরি করা হচ্ছিল। সেই সময় আমার শিবপুর সৃষ্টির প্রত্যেক জনকে দেখে মনে হয়নি যে আমার সেই দিনটার প্রথম দিন এতটা একটা মিশুকেও পরিবারের মতন ।এরকম একটা গ্রুপ দেখা যায় না।

Q : একটা ছোট্ট করে রাপিড ফায়ার রাউন্ড :-

অবসর সময় সিনেমা দেখা নাকি বই পড়া ?

>> বই পড়া।

Q : বিরিয়ানি নাকি ফুচকা ?

>> বিরিয়ানি।

Q : শপিংমল এ গিয়ে কেনাকাটা করা নাকি মার্কেটে গিয়ে দরদাম করে কেনাকাটা করা?

>> অবশ্যই দরদাম করে দাম কমিয়ে কেনাকাটা করা.

Q : সৌরভ গাঙ্গুলী না শচীন টেন্ডুলকার ?

>> সৌরভ গাঙ্গুলী ।

Q : পাহাড় না সমুদ্র ?

>> পাহাড়।

Q : এসপ্ল্যানেড না গড়িয়াহাট।

>> এসপ্ল্যানেড।

Q : সবশেষে চা না কফি ?

>> অবশ্যই চা.

Q : পরিধান, শিক্ষণ আর সবুজ সংকল্প এই তিনটে কে ১ ২ ৩ হিসেবে সাজালে কিভাবে সাজাবে ?

>> অবশ্যই শিক্ষণ কে আগে রাখবো দ্বিতীয় নম্বরে থাকবে পরিধান আর সবার শেষে থাকবে সবুজ সংকল্প।

~ অতীশ কুমার সিং

Q : লকডাউন এ কেমন কাটছে দিন গুলো ?

>> কাটছে বাড়িতে থেকে । একটানা এতদিন পর পর বাড়িতেই বা কতদিন ভালো লাগে। কিন্তু বর্তমানে বাড়িতে থাকাটাই ভালো। করোনা যেভাবে বেড়ে চলেছে। বাড়িতে বন্ধুদের সাথে ফোনে ভিডিও কল করি। এই ভাবেই কাটছে।

Q : বাচ্চাদের জন্য কিছু করা এই চিন্তাটা মাথায় কোথা থেকে এলো ?

>> একদিন কিছু গরিব বাচ্চাদের দেখে মনে হল শিক্ষাটা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া কিভাবে যেতে পারে। তাই সাধ্যমত চেষ্টা করতাম কোন একটা গরিব বাচ্চাকে সাহায্য করতে। আমি এই মুহূর্তে পয়সা দিয়ে সেই ভাবে হয়তো সাহায্য করে উঠতে পারব না তাই ভাবলাম সৃষ্টির সাথে যোগদান করে যদি কিছু করা সম্ভব হয়।

Q : শিবপুর সৃষ্টির কথা তুমি জানলে কোথা থেকে ?

>> প্রথমত আমি সৃষ্টির একটি পদযাত্রায় যোগদান করি তারপর শিবপুর সৃষ্টির ফেসবুক পেজে দেখি ওদের বিভিন্ন কাজ ওরা কিভাবে কাজ করে, প্রসেসিংটা কিভাবে হয়, এছাড়া আমার অনেক বন্ধুরা এনজিওতে রয়েছে এই সবকিছু মিলেই সৃষ্টিকে চেনা।

Q : এখন অনেক এনজিও বাচ্চাদের জন্য অনেক কিছু করছে সেক্ষেত্রে শিবপুর সৃষ্টিকেই বেছে নেওয়ার কারণ কি ?

>> সত্যি কথা বলতে শিবপুর সৃষ্টিতে আমি যতদূর দেখেছি এদের কাজটা অনেকটা বেশি। বলতে গেলে এক দেড় মাস ছাড়াই এদের কোনো না কোনো প্রজেক্ট থাকে। শিবপুর সৃষ্টির কাজটা অনেক বেশি ভালো। বলছিনা যে অন্যান্য এনজিও ভালো কাজ করে না তাদের কাজও খুবই ভালো । কিন্তু শিবপুর সৃষ্টির যে কাজগুলো হয় তার প্রসেসিংটা ধাপে ধাপে আমরা জানতে পারি আমাদের কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে।

Q : সৃষ্টিতে কতদিন হলো তুমি আছো ?

>> এই ৪ মাস মতো হল।

Q : তোমার আসার পর সৃষ্টিতে সেই ভাবে কোন প্রজেক্ট হয়নি। সৃষ্টির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলে। কেমন লাগলো?

>> ভালোই লেগেছে। মোটামুটি সবাই সমবয়সী সবাই মিলে যে অনুষ্ঠানটা করেছে সেটা খুব ভালো লেগেছে। সবার মধ্যে একটা আন্তরিকতা ছিল।

Q : পরিধান, শিক্ষণ ও সবুজ সংকল্প এই তিনটে এর মধ্যে কোনটাকে তুমি একটু হলেও বেশি গুরুত্ব দেবে ?

>> অবশ্যই শিক্ষণ। কারণ পশ্চিমবঙ্গের যা পরিস্থিতি সেই দিক থেকে দেখতে গেলে শিক্ষা টা খুব জরুরি।

Q : করোনার মতন এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে সৃষ্টি বেলপাহাড়ি মতন এলাকায় সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে এই বিষয় নিয়ে তুমি কি বলবে ?

>> ঠিক কথা কোরোনার মতন এই পরিস্থিতিতে সৃষ্টি মানুষের পাশে যেভাবে দাঁড়াচ্ছে এইটা এই মুহূর্তে দরকার এখন যদি না দাঁড়ায় কখন দাঁড়াবে। সৃষ্টি এই ভাবেই কাজ করে যাক এটাই চাই।

Q : যদি বলা হয় ছোট করে সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বলতে, তুমি কি বলবে ?

>> সৃষ্টির সবার মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে এছাড়াও বন্ধু-বান্ধবদের মতন একটা পরিবারের মতন। এখনো সেইভাবে সৃষ্টির সাথে মেলামেশা হয়ে ওঠেনি এই লকডাউন এর জন্য। কিন্তু যতটুকু দেখেছি তার মধ্যে থেকে এটাই দেখতে পেয়েছি।

Q : একটা ছোট্ট করে রাপিড ফায়ার রাউন্ড :

অবসর সময় সিনেমা দেখা না বই পড়া ?

>> সিনেমা দেখা।

Q : শপিং মলে কেনাকাটা করা নাকি দরদাম করে কেনাকাটা করা ?

>> শপিং মল।

Q : পাহাড় না সমুদ্র ?

>> পাহাড়।

Q : চা না কফি ?

>> চা।

Q : এসপ্ল্যানেড না গড়িয়াহাট ?

>> গড়িয়াহাট।

Q : সৌরভ গাঙ্গুলী না শচীন টেন্ডুলকার ?

>> সৌরভ গাঙ্গুলী।

Q : বিরিয়ানি না ফুচকা ?

>> বিরিয়ানি।

Q : পরিধান ,সবুজ সংকল্প, শিক্ষণ এই তিনটিকে ১ ২ ৩ আকারে সাজালে তুমি তোমার দিক থেকে এটিকে কিভাবে সাজাবে ?

>> অবশ্যই শিক্ষণ, পরিধান, সবুজ সংকল্প এই আকারে সাজাবো।

~ অর্পন মাইতি

Q : করোনা বা লকডাউন এর মধ্যে কেমন আছো বলো ?

>> লকডাউন এ খুব একটা খারাপ কাটছে না, কাজকর্ম সব ঠিকঠাকই আছে, আমার তো জলের ব্যবসা মোটামুটি ভালোই চলছে।

Q : সৃষ্টির সাথে অনেকদিনের পরিচয় তোমার। সৃষ্টির সাথে যোগ হওয়াটা কিভাবে ?

>> বাদশাদাদের গ্রুপটা একটা নতুন কিছু করবে বলে আলোচনা করছিল সময়টা ছিল দুর্গাপূজার সময় । সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা দিয়ে প্রথম বছর অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরপর দু'বছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার পর , সবাই মিলে চিন্তা করা হয় একটা কিছু এইবার করা যেতে পারে। বয়স তখন কম হওয়ায় ফাউন্ডার মেম্বার হয়তো হতে পারিনি। বলা যেতে পারে সৃষ্টির প্রথম শুরু থেকেই আমি আছি।

Q : তোমার প্রথম প্রজেক্ট কোনটা ছিল ?

>> নলপুরের কাজ আমার প্রথম প্রজেক্ট।

Q : পাড়াতে একটা এই ধরনের সংগঠন তৈরি হওয়ার জন্যই কি সৃষ্টিতে যোগ দেওয়া নাকি আগে থেকেই তোমার ইচ্ছে ছিল ?

>> সত্যি কথা বলতে যেদিন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই নিজের সাধ্যমত দুঃস্থদের দান করতাম। তাই একটা সংগঠন তৈরি হয়েছে বলেই সৃষ্টিতে যোগদান করা তা নয়। যাদের সত্যিকারের দরকার তাদেরকে দেখলেই বোঝা যায়। তাদের জন্য কিছু করার মনোপ্রবৃত্তি প্রথম থেকেই ছিল।

Q : সৃষ্টির ইনিশিয়েটিভ টিমে তোমার কাজটা যদি একটু বল ?

>> ইনিশিয়েটিভ টিমে আমাকে সেইভাবে খুব একটা কাজ দেওয়া হয়না কারন আমার প্রফেশনটা প্রচন্ড আলাদা। আমি ব্যাংক এর যত রকম কাজ থাকে যেমন টাকা জমা দেওয়া সেটা তোলা এই ধরনের যাবতীয় কাজ করে থাকি। একবছর ক্যাশিয়ার ও ছিলাম পুজোর। তাই ইনিশিয়েটিভ টিম বলতে কোন পার্টিকুলার কাজ নয় সৃষ্টির সব রকম কাজই মোটামুটি করা হয়।

Q : সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো প্রজেক্ট হয়েছে , তার মধ্যে সবথেকে তোমার প্রিয় প্রজেক্ট কোনটা ?

>> আগের বছর পুজোয় বেলপাহাড়ি তে গিয়ে যে কাজটা করা হয়েছে সেই প্রজেক্টটা আমার কাছে প্রিয় কারণ যে সব মানুষের সত্যিই দরকার তারা সেই জিনিসটা পাচ্ছে। আমাদের ওখানে শিক্ষণ এর কাজ চলছে । এছাড়া আমাদের বাকি প্রজেক্টগুলোও প্রিয় কিন্তু বেলপাহাড়ির কাজটা সবথেকে বেশি প্রিয়।

Q : Covid-19 বা করোনা নিয়ে যে এখন রিলিফ ফান্ড চলছে আমাদের সৃষ্টিতে সেইটা নিয়ে তোমার ওপিনিয়ন কি ?

>> করোনা নিয়ে আমাদের যে রিলিফ ফান্ড চলছে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে একজন মানুষ হিসেবে বা একটা এনজিওর হয়ে সব মানুষের কাছে রেশন পৌঁছে দেওয়া । আমরা যে সমস্ত কাজ করি পুজোর সময় নতুন জামা কাপড় দেওয়া এই সব কাজকে ফেলে রেখে এখন যে বিশ্ব মহামারী চলছে তার জন্য মানুষের পাশে দাঁড়ানো। কারণ আমরা যাদের নতুন জামাকাপড় দিয়ে কিংবা শীতকালে শীতবস্ত্র প্রদান করি তারা কোন না কোনভাবে সেই জামা কাপড় টা বছরে একবার হলেও অন্য কোথা থেকে হলেও পেয়ে থাকে। কিন্তু এই সময়ে আমরা একটা এনজিও হিসেবে দুঃস্থ মানুষদের পাশে অন্তত এই লকডাউন বাজারে মানুষের কাছে রেশন টুকু পৌঁছে দিতে পারছি এটা অনেক বড় ব্যাপার ।

Q : এবার একটা রাপিড ফায়ার রাউন্ড :

চা না কফি ?

>> চা।

Q : অবসর সময়ে সিনেমা দেখা না বই পড়া ?

>> সিনেমা দেখা।

Q : বিরিয়ানি না ফুচকা ?

>> ফুচকা।

Q : শপিং মলে শপিং করা নাকি দরদাম করে কেনাকাটা করা ?

>> শপিং মলে কেনাকাটা করা।

Q : ডাইরেক্টর হিসাবে অপর্ণা সেন না ঋতুপর্ণ ঘোষ ?

>> ঋতুপর্ণ ঘোষ।

Q : মেসি না নেইমার ?

>> নেইমার।

Q : পাহাড় না সমুদ্র ?

>> পাহাড়।

Q : এসপ্ল্যানেড না গড়িয়াহাট ?

>> এসপ্ল্যানেড।

Q : শিক্ষণ, পরিধান আর সবুজ সংকল্প এই তিনটিকে যদি পরপর সাজাতে বলি তুমি তোমার দিক থেকে কিভাবে সাজাবে ?

>> পরিধান, শিক্ষণ ও সবুজ সংকল্প এই আকারে সাজাবো

Q : একজন সৃষ্টিয়ান হিসাবে তোমার কিছু বক্তব্য ?

>> সৃষ্টির ভলেন্টিয়ার বর্তমানে বেড়েছে ভবিষ্যতে আরো বাড়ুক। আরেকটি কথা সৃষ্টির যেসব অফিশিয়ালি ডিসিশন নেওয়া হয় সেই প্রসেসিং টা একটু তাড়াতাড়ি করার।

~~~~~~~~~~ 0 ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

শিক্ষন , এক প্রচেষ্টা

shikshan
An initiative by "Shibpur Sristi"

প্রেক্ষাপট :-

২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার ৭৬.২৬% । ভারতবর্ষের ২৮ টি রাজ্য এবং ৮ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ২০ (Wikipedia)।

২০০১ সালে পরিসংখ্যানের তুলনায় সাক্ষরতার হারের পরিবর্তন খুবই কম, মোট গড়ের উপর। শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৮৪.৭৮% এবং ৭২.১৩%। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর অনুপস্থিতির জন্যই এই পার্থক্য।

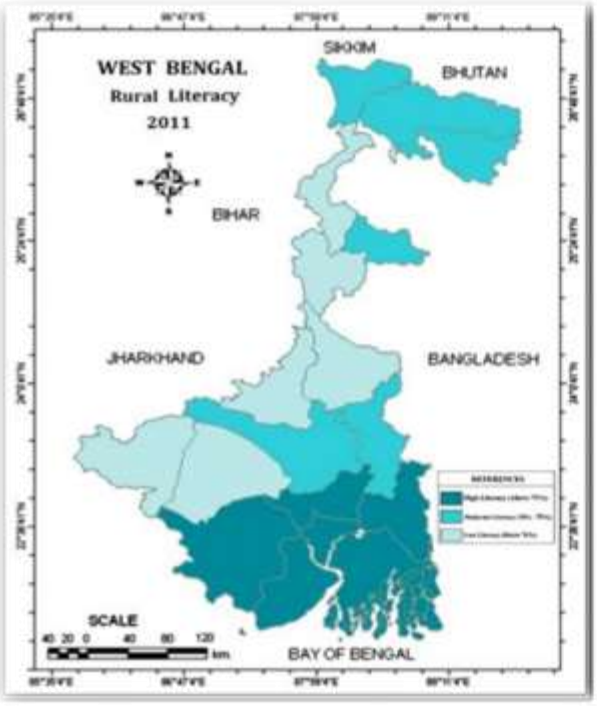

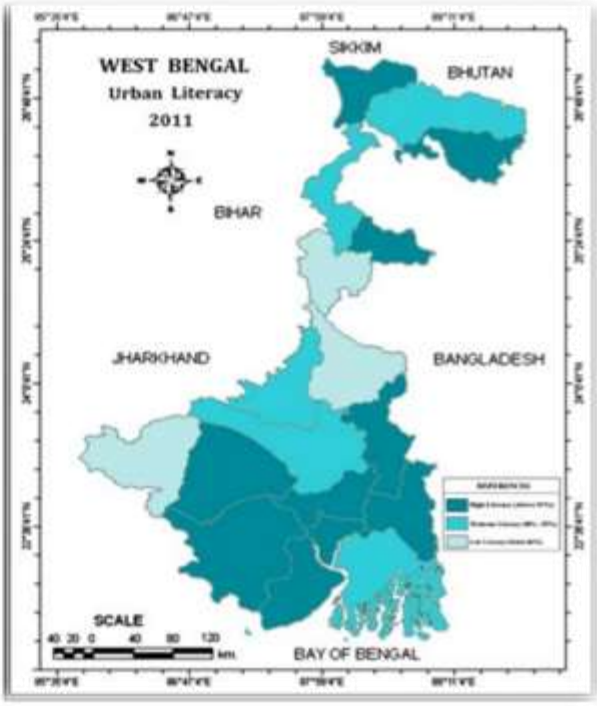

উদ্দেশ্য :-

২০১৪ সালের "শিবপুর সৃষ্টি"-র শিক্ষণ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেই সমস্ত শিশুদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। যাদের ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য নেই, সেই সমস্ত জায়গায় শিক্ষার আলো পৌঁছানো যেখানে এখনও মানুষ শুধুমাত্র সামান্য অর্থের অভাব এবং সামাজিক টানাপড়েনের সম্মুখীন হয়ে, শিশু অবস্থাতেই আর্থিক উপার্জনের জন্য এগিয়ে যেতে হয়। শিবপুর সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই

সীমিত নয়। বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় তাদের শহরের শিশুদের সমতুল্য করে তোলা।

বর্তমানে চলতি প্রকল্প :-

বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ী অঞ্চলের দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় – ১) জারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২) লোধাশুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর মোট ১৩০ জন ছাত্রছাত্রীর বার্ষিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য পাঠ্যপুস্তক, খাতা, পেন, পেন্সিল সৃষ্টি-র তরফ থেকে পৌঁছে দেওয়া হয়। ওখানকার বাচ্ছাদের মধ্যে ছবি আঁকা এবং হাতের কাজের দক্ষতা দেখে তাদের পড়ালেখার সরঞ্জামের পাশাপাশি আঁকার খাতা, রঙ-তুলি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে সৃষ্টি। পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ক্রীড়াসামগ্রী পাঠানোরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ওই দুটি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বাচ্ছার জন্য free tuition-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুটি বিদ্যালয়ে ৫ জন করে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা আছে এই কাজের জন্য, তারা যত্ন সহকারে স্কুল টাইমের পর শিশুদের পড়ান। এছাড়া বিভিন্ন রকম পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শিবপুর সৃষ্টির পক্ষ থেকে পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন করতে যাওয়া হয় এবং বিভিন্ন আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থা যেমন – Spoken English এবং Basic Computer-এর কিছু ভাবনা তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

সহযোগিতা :-

শিবপুর সৃষ্টির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা ওই বিদ্যালয়গুলিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে শিশুরা সমস্ত রকম সুবিধার মধ্য দিয়ে তাদের লেখাপড়া এবং খেলাধুলার মাধ্যমে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

- শিক্ষাসামগ্রী – সহায়িকা পুস্তক, খাতা, পেন, পেন্সিল, রাবার, শার্পনার
- অঙ্কনসামগ্রী – আঁকার বই, আঁকার খাতা, রঙ
- ক্রীড়াসামগ্রী – ফুটবল, ফুটবল কোন

এইসমস্ত সামগ্রীগুলি arrange করার জন্য শিবপুর সৃষ্টিকে সাহায্য করেন আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষজন।

ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা :-

জারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়, লোধাসূলী প্রাথমিক বিদ্যালয় এই দুটি বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষার বিকাশের জন্য কম্পিউটার ক্লাসের ব্যবস্থা করা যেখানে তারা নিজেরা কম্পিউটারে কার্যকরীভাবে কাজ শিখতে পারবে।

শিক্ষণ সম্পর্কে শিবপুর সৃষ্টি সম্পাদক সুমিত সামন্ত-র থেকে কিছু কথা জানবো।

- শিক্ষণ-এর ভাবনা টি কিভাবে এসেছিলো ?
  - আমরা মূলত বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি। একদা শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য শিক্ষা বড় ভূমিকা পালন করে। আমরা যদি কয়েকজন শিশুকেও ঠিকঠাক শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করে দিতে পারি তাহলে সমাজের জন্য কিছু করতে পারবো। এই চিন্তাভাবনা থেকেই Sikshan Brand-টার পরিকল্পনা করা এবং কাজ শুরু।
- শিক্ষণের শুরুটা কিরকম ছিল ?
  - আমরা প্রথমে নলপুরের একটা বিদ্যালয়ে গিয়ে তাদের কিছু শিক্ষাসামগ্রী দিয়ে আসি। এইভাবে শুরু করি, তারপর ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ী অঞ্চলে কাজ শুরু করি।

- শিক্ষণের বর্তমান status কি ?
  - বর্তমানে আমরা ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ী অঞ্চলে দুটি বিদ্যালয় adopt করে সেখানকার বাচ্ছাদের জন্যে কাজ করছি। যেমন- তাদের বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করা, তাদের জন্য free tuition-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সৃষ্টিয়ানস রা যে পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শনে যায় সেই সময় শিশুদের Spoken English, Basic Computer শেখানো হয় ও বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নেওয়া হয়।

২০২০ তে আমরা কিছু নতুন পদক্ষেপ নিয়েছি। যেমন দুটি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বাচ্ছার জন্য আঁকার সামগ্রী পাঠানো। Book Bank-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শিশুরা পাঠ্যপুস্তক

ছাড়াও reference বই এর সাহায্য নিতে পারে। Library করা হয়েছে যেখানে শিশু উপযোগী বিভিন্ন গল্পের বই, Magazine রাখা হয়েছে যার মাধ্যমে শিশুরা জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

- শিক্ষণের পরবর্তী চিন্তাভাবনা কি ?
  - শিক্ষণ brand টা করার উদ্দেশ্য ছিল সেই সমস্ত শিশুদের সাহায্য করা যারা শুধুমাত্র টাকা এবং সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে পড়াশোনা করতে পারছেনা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি শিবপুর সৃষ্টি কিছুটা হলেও তাদের লক্ষ্যের দিকে এগোতে পেরেছে।

আমাদের পরবর্তী চিন্তাভাবনা রয়েছে বেলপাহাড়ী অঞ্চলে একটি বিদ্যালয় বানানো। ওখানকার বাচ্ছারা সমস্যার মধ্যে দিয়ে প্রাইমারী শিক্ষাটুকু হয়তো পাচ্ছে কিন্তু তারপর বিদ্যালয়ের অভাবে তারা আর আগে পড়তে পারছে না। ওখানকার শিশুরা যাতে প্রাইমারী শিক্ষার পরও পরবর্তী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে সঠিক পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে সেই জন্য আমরা এই চিন্তাভাবনা করেছি। আশা করি বর্তমানে শিবপুর সৃষ্টি যেভাবে ওই শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছে তেমনি ভবিষ্যতেও আমরা আমদের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেব এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ দিতে পারবো।

ধন্যবাদ

উড়ো চিঠি

To তুহিন দা

আমি সৃষ্টি তে যুক্ত হবার পর থেকে আজ অবধি অনেক টিম এ ছিলাম। কিন্তু আমার দেখা বেস্ট এবং আমার খুব প্রিয় টিম লিড তুমি। শুধু একটা কথা বলতে চাই এখন তো তুমি দুটো টিম সামলাচ্ছ তাহালে কেন আবার আইডিয়া মাইনিং টিম এ লিড এর দরকার? তুমিই থেকে যাও প্লিস।

To শ্রীজিতা দি

আমার থেকে বয়সে অনেক বড় হলেও বন্ধুর মতোই যেকোনো কথা তোমায় প্রাণ খুলে বলতে কোনো দ্বিধা হয় না আমার, সময়ে অসময়ে যখনই দরকারে তোমায় ফোন করি তখনই তোমায় পাশে পাই.... তোমাকে চিঠি লিখতে শুরু করলে তো আর এক পাতা কিংবা দু পাতায় শেষ হবে না, সব কথা তো উড়ো চিঠিতে লিখতেও পারবো না.... বর্তমানে তুমি শিবপুর সৃষ্টির head creative, তোমায় অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই....

To সুপ্রতীম

দেখ ভাই হঠাৎ হঠাৎ মাথা গরম করাটা ভালো নয়। বোঝার ক্ষমতা বাড়াও, নিজের কাজের ওপর ভরসা রাখো। 😁

To সুস্মিতা সরকার

All beautiful ladies aren't actresses...
Some are Nutritionists too...
And the example is you...

To তুহিন দা

প্রথম দেখা ছবির ভাঁজে,
জন্ম দিনের উপহার সাজে।
মুখের আদল কবির ভাব ___
ছন্দ বদ্ধ পাণির কাজ।
নেতৃত্বের কায়দা দারুন,
বেজায় চালাক, বেজায় করুন।
নম্র স্বভাব, কর্ম দাস
পছন্দ তার ভারতীয় সাজ ।।

উড়ো চিঠি

To অনিমেষ দা

সৃষ্টিতে আসার প্রথম দিন থেকেই তোমাকে খুব ভালো লাগে।। 😊

To বাদশা দা

তুমি আমাদের স্বপ্নের কান্ডারি। তোমার ছত্র-ছায়ায় আমরা সৃষ্টির কাজে করি। তোমার রাগটা খুব sweet.

To পানি দা

প্রেসিডেন্ট হিসেবে খুবই ভালো লাগে। তোমার লিডারশিপের fan আমি।।

To সুপ্রতীম দা

আমার অনেক দিনের ইচ্ছা তোমার গল্পের নায়িকা হবো।।

To বাবুসোনা দা

অনেকদিন ধরেই তোমার fan. তোমার মধ্যে যে Adventure ব্যাপারটা আছে সেটা আমায় খুব টানে।।

To সাহেব দা

তোমার কাছে English শিখতে চাই।

উড়ো চিঠি

To রাহুল দা

তোমার Photography নিয়ে কোনো কথা হবে না। তোমার গোঁফ টা কিন্তু দারুণ।

To লাবনী দি, ডিনা দি, পৌলমি দি

তোমাদের খুব মিস করি। আগে কত আসতে এখন কেন আসো না??

To ঐকান্তিকা

পুচকে মেয়ে তবে দুষ্টু ও বটে।
কাজের খুব চেষ্টা আছে। এগিয়ে যাও।

To অবন্তীকা

তোমার নাটক দেখার পর থেকে তোমার অন্ধ ভক্ত। তোমার হাসিটা হেব্বি লাগে।

To অমিত দা

সারাদিন এত ব্যস্ত থাকলে হবে! একটু আমাদের দিকেও দেখো।

To সৌমি

তোমার নাচটা খুব ভালো লেগেছিল।

ধন্যবাদ

সম্পাদক - তুহিন চক্রবর্তী

সহ সম্পাদিকা - নেহা ভট্টাচার্য্য

প্রধান পরামর্শদাত্রী - শ্রীজিতা বাগ

পরামর্শদাতা - সুমিত সামন্ত

বিশেষ পর্যবেক্ষক - সুপ্রতীম মুখার্জী

প্রধান চিত্রকর - অমিত মান্না

সহ চিত্রকর - তন্ময় কোলে

সহ চিত্রকর - সুমন চৌধুরী

সম্পাদক সহকারী - ঐকান্তিকা সিনহা

সম্পাদক সহকারী - প্রীয়াঙ্কা দত্ত

সম্পাদক সহকারী - পূজা দাস

সম্পাদক সহকারী - অবন্তিকা সামন্ত

সম্পাদক সহকারী - মেঘা পাত্র

সম্পাদক সহকারী - তপেন্দু বাকুলি

সম্পাদক সহকারী – স্বেতা কোলে